বন্দে মাতরম্।

বর্ত্তমান

রণ-নীতি।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৫ নং রামধন মিত্রের গলি, "সুমতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস" হইতে,

শ্রীবিভূতিভূষণ রায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৫

মূল্য ৸৹ বার আনা।

নিবেদন।

এবার ত্বরা-বশতঃ "রণ-নীতিতে" নানা ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গেল, এবং সামরিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কয়েকটী আবশ্যকীয় বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিতে পারা গেল না। রণ-নীতির গ্রাহকগণ এই সকল অভাব ও ক্রটী নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন, আমাদের এ বিশ্বাস আছে। উৎসাহ পাইলে দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার সম্পূর্ণ নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করিব। ইতি—

২৪পরগণা—আড়বালিয়া,
২০এ আশ্বিন, ১৩১৪ সাল।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
প্রকাশক।

ক্যানেট কামান।
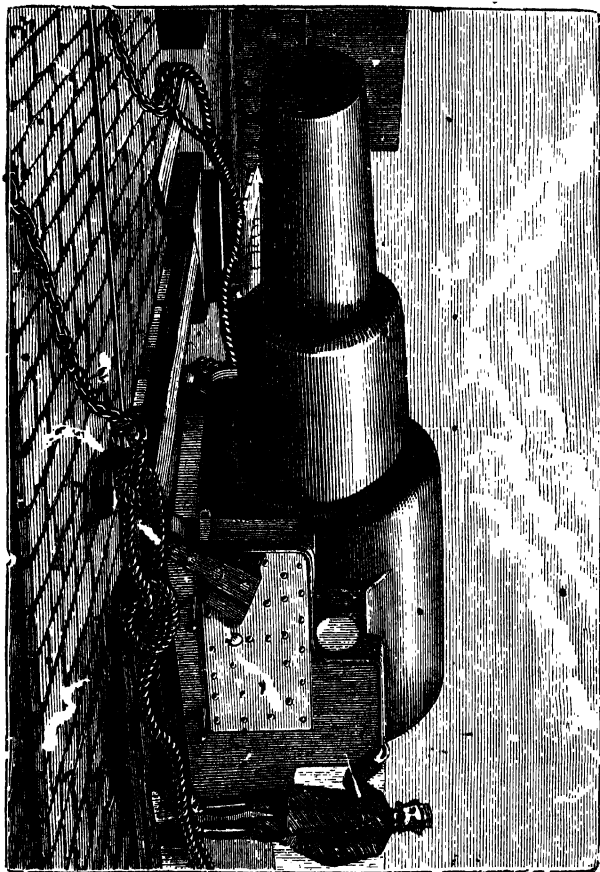
প্রথম খণ্ড।

অস্ত্র, সজ্জা ও সেনা।
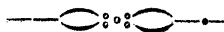
রণ-নীতি।
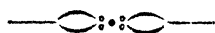
প্রথম পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধই সৃষ্টির নিয়ম।

যে দিন অনাদি প্রজাপতির কল্পনা মাত্রেই এই সৃষ্টিরূপ মহাপদ্ম ফুটিয়া উঠিল সেই দিন হইতে উৎপত্তি জন্ম বা বিকাশের একই নিয়ম—ঘাত ও প্রতিঘাত। ছায়ার নাশে আলোর জন্ম হয়, আবার আলোকের অভাবে ছায়া দেখা দেয়; তেমনি পাষাণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বালির সৃষ্টি করে, বালি চূর্ণ করিলে মাটি হয়, আবার মাটি পোড়াইলে তাহা ভস্মের রূপ ধরে। সুতরাং ধ্বংস সৃষ্টিরই রূপান্তর মাত্র, নূতন গড়িতে হইলেই পুরাতন ভাঙ্গিতে হয়, এক বস্তু নষ্ট হইয়াই অন্য বস্তু রূপে জন্ম লয়।

ধ্বংস স্বাভাবিক, তাই যুদ্ধও স্বাভাবিক। দেহের কোন স্থান পচিলে অস্ত্র প্রয়োগে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিতে হয়, নতুবা সেই গলিত ক্ষত প্রসার লাভ করিয়া দেহের নাশ ঘটায়। জাতির অঙ্গে বা সমাজের জীবনে পাপ, উৎপীড়ন ও পরাধীনতা গলিত ক্ষত বিশেষ, তাহা অনেক সময়ে সমাজ-শরীরে বা জাতি-শরীরে দুরারোগ্য হইয়া প্রবেশ করে। অত্যাচার যখন আর-

কোন উপায়েই শান্ত হয় না, দাসত্বকুষ্ঠ যখন জাতি-দেহে রক্ত দূষিত করিয়া তাহার জীবনীশক্তি অপহরণ করে, তখনই যুদ্ধ অনিবার্য্য। এই জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র সমরে ধৃতবল্গা সারথী, এই জন্য রাবণবধে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কল্পনা, এই জন্য দৈত্য সংহারে তেত্রিশ কোটি দেবতার ওজঃ লইয়া চণ্ডীর প্রকাশ, এবং এই জন্যই কলি যুগে "ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্" কল্কির উদয় শাস্ত্রবাক্যে পরিণত হইয়াছে।

এ জগতে কীটাণু হইতে মহাগজ অবধি সকলেই আপনাপন জীবন-যুদ্ধে যোদ্ধা। সকলের মধ্যেই মহাশক্তি সুপ্ত রহিয়াছে, আপনাকে না চিনিলে সে শক্তি জাগে না; কর্ম্ম করিলেই শক্তির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে, মানুষের আত্মোপলব্ধি (Self-realisation) আসে, তাহার দেহ-আধারে মহা পুরুষের জন্ম হয়। সুতরাং কর্ম্ম চাই, জাপানের কর্ম্মযোগের গীতাকার Oyomei বলেন "To know is to be, virtue is real in so far only as it is manifested in deeds." "জ্ঞান অর্থে তাহার কর্ম্মে পরিণতি,-পুণ্য যতক্ষণ না সৎকার্য্যের ফলরূপে জন্ম লয় ততক্ষণ তাহা প্রকৃত পুণ্যপদবাচ্য নহে।" তাই পণ্ডিত রাজনীতিবিৎ ওকাকুরা বলিতেছেন, "A reincarnation is self-realisation on a different plane." "জীবনের নূতন ক্ষেত্রে আত্ম-উপলব্ধির ফলে সুপ্ত শক্তির মহাস্ফুরণ ঘটিলে তাহারই নাম অবতার।" মদমত্ত লোভী পাপাচারী ইউরোপের সম্মুখে জাপান আজ কর্ম্মবলে ভয়াল গীতাতত্ত্বের অবতার—পরিবর্ত্তনের অনুপ্রাণনের দেবতা।

এ অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি অকাতর নিঃস্বার্থ কর্ম্মেরই ফল, তাই

ওকাকুরা বলিয়াছেন, "Until the moment we shook it off, the same lethargy lay upon us which now lies on China and India. Over our country brooded the night of Asia enveloping all spontaneity within its mysterious folds. Intellectual activity and social progress became stifled in the atmosphere of apathy. Religion could but soothe, not cure the suffering of the wounded soul." "আজ চীন ও ভারতের বক্ষে তামসিক জড়তার পাষাণ যেরূপে চাপিয়া রহিয়াছে, জাপান যতদিন স্বেচ্ছায় তাহা দূরে নিক্ষেপ করে নাই ততদিন সেই পাষাণ-ভার জাপানকেও অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়াছিল। আপন তমাচ্ছ গর্ভে সকল অনুপ্রাণন-শক্তি গ্রাস করিয়া তখন সেই এসিয়ার কাল-রাত্রি জাপানের বক্ষেও বিরাজ করিতেছিল। সে সময়ে কর্ম্ম-হীনতার খর্পরে পড়িয়া সকল মানসিক উন্নতি ও সামাজিক জীবনই মরিয়া যাইত; ধর্ম্মের মন্ত্র রুগ্ন প্রাণকে শীতল করিত বটে, কিন্তু রোগমুক্ত করিতে পারিত না।"

আজ কিন্তু জাপানের ব্যাধি সারিয়াছে, তাই জাপান আজ কেবল রমণীয় পুষ্প চিত্র বা নারীর দেশ নহে, আজ তাহা রণদেবীর পীঠভূমি।

কর্ম্ম মুক্তির উপায়, ইহা পুরুষের ঐশ্বর্য্য। হিন্দু এই কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে সত্বাত্মিকা আত্মা-শক্তির স্থাপনা করিয়াছে। মা শ্বেতবরণা, অর্থাৎ তমোক্লেদবিহীনা রজঃজনিত-অশান্তিরহিতা যোগস্তিমিতা সত্বশক্তি ! মা দশভূজে দশায়ুধধারিণী কারণ চিরকর্ম্মময়ী অনন্তবীর্য্যা সৃষ্টিমাতা; দক্ষিণে দেশের ধন-

শক্তি রক্তচরণা শ্রী,বামে বিদ্যাবিজ্ঞানশক্তি বাণী, সঙ্গে জনশক্তি রণোন্মত্ত দেবসেনাপতি ও সিদ্ধিমূর্ত্তি গণপতি। ইহা মাটির পুতুল নয়, ত্রিশকোটীজনময় যে জীবন্ত ভারত লয়কর্ত্তা কালকেও জয় করিয়া অদ্যাপি অর্য্যাবর্ত্তে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই প্রাণময় ভারতের শক্তি বল বিদ্যা ধন তপস্যা যোগ সকলি ঐ নয়নরম্যা মূর্ত্তিতে জাগিতেছে। হে আর্য্য, তুমি পুরুষ, আর ঐ তোমার পূর্ণা লীলাময়ী শক্তি। কত কর্ম্ম করিলে, আর্য্য! অত বড় শক্তির অধিকারী হয়, কত দেহ কত মুণ্ড দিলে ঐ মাকে ঘরে আনিতে পারা যায়, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?

ভারতে কর্ম্মের মূর্ত্তি দুর্গা, এবং নবভানুলাঞ্ছিত জাপানে কর্ম্মের মূর্ত্তি মহানাগ। এই ভুজঙ্গম এত দীর্ঘ যে কেহ তাহার পূর্ণ প্রকাশ দেখে নাই, এত তীক্ষ্ণবিষ যে ফুৎকারে জগত গরলে দগ্ধ করিতে পারে, এত করালদর্শন যে জলধির গর্জ্জনে তড়িতের অগ্নিছুরিকায় ঝঞ্ঝার আলোড়নে ইহার ক্ষণিক প্রভাব দেখা যায়। এক অতল গুহার শিখরে শিখরে অনন্ত পাকে জড়াইয়া এই কর্ম্ম আশীবিষ গর্জ্জিতেছে। আইয়োমাই এই কর্ম্মযোগের গীতাকার, তাঁহার ধর্ম্মের মতে প্রতি মানব জীবন এক একটি সপুষ্পচন্দন ব্রত, এই ব্রতের উদ্যাপনই ধর্ম্ম এবং এই ব্রতের অনুভূতির অভাবই মৃত্যু।

আজিকার তরুণ ভারত কর্ম্মযোগী। এ যোগে ফলের লালসা নাই অথচ অক্ষ জাহ্নবীর বেগ আছে, আপন বলিবার কিছু নাই অথচ পূর্ণাঙ্গ আত্মবিক্রয় আছে, জীবনের ভয় নাই অথচ মরণে গর্ব্ব ও সাধ আছে, পরার্থে শ্রমবিরতি নাই অথচ অনন্তদল আত্মার অনুভূতিতে পরম তৃপ্তি আছে।

মহাশক্তির পূজক ভারতের এই কর্ম্ম পন্থা ভুলিলে চলিবেনা। ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি ও ক্ষত্রিয়ের দেহধূলিতে পুণ্যময় মহাতীর্থ ভারত আজ মৃত বটে, অবনতির পুতিগন্ধে গলিত শবাকার বটে, কিন্তু শব না হইলে শক্তি সাধক তান্ত্রিকের সাধনা হয় না। সাধনায় সিদ্ধ হইলে শাক্ত ধর্ম্মরাষ্ট্রের প্রবর্ত্তয়িতা হয়, আর শাক্তের আসন গলিত শব জীবিত হয়। ইতিহাস ইহার সাক্ষী।

কর্ম্ম চাই, কর্ম্মের ফল যশ। কিন্তু যশের মূল্য বড় অধিক, দধিচির মত গণিয়া গণিয়া নিজ অস্থিপঞ্জর না দিলে যশ-সম্পদ মিলে না। আফিমের প্রসাদে বিশ্ব বাজারে ঘুরিতে ঘুরিতে কমলাকান্ত যশের দোকানে কি দেখিয়াছিল ?—"দেখিলাম দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। ডাকিয়া দোকানদারের উত্তর পাইলাম না—কেবল এক সর্ব্ব-প্রাণীভীতিসাধক অনন্ত গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম—অল্পালোকে দ্বারে ফলকলিপি পড়িলাম।

যশের পণ্য-শালা

বিক্রেয়—অনন্ত যশ।

মূল্য—জীবন।

জীয়ন্তে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

এই যশসম্পদ লাভ করিতে হইলে জাতীয় জীবনে মহা রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা চাই ; এ ধর্ম্মের পাঁচটি প্রাণসংরক্ষিণী নাড়ী আছে, যথা, ধর্ম্ম, অন্ন, ধন, লোক ও ক্ষাত্রবীর্য্য। এই পঞ্চশক্তির সমবায়েই জাতীয় শক্তির ষোড়শকলা পূর্ণচন্দ্রের উদয় সম্ভব। শষ্যাঞ্চলা ভারতভূমে অন্নের অভাব নাই, ত্রিশকোটী আর্য্যের দেশে লোকবলও অন্বেষণ করিতে হয় না, ঋষির তপোভূমি

আর্য্যাবর্ত্তেই নিখিল ধর্ম্মের শৈশব দোলা। কেবল অভাব অর্থ ও ক্ষাত্রশক্তির, সুতরাং তাহা অর্জ্জন করিতে হইবে। বহিস্কার ও স্বদেশীর স্বর্ণমন্দিরে পদ্মালয়া কমলার আসন পড়িয়াছে, আর মহাকাল ইংরাজের নালিকা সঙ্কেতে দেখাইতেছে, "দেখ, ক্ষাত্র-বীর্য্যই ইউরোপের রাজপ্রাসাদের শিল্পি;ক্ষাত্রবীর্য্য অর্জ্জন কর।"

ক্ষাত্রশক্তি প্রত্যেক আর্য্যের অস্থিমজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে; কেবল সে লীনশক্তির বিকাশ আবশ্যক। যোদ্ধার প্রথম অস্ত্র তীক্ষ্ণ কার্য্যকরী বুদ্ধি ও দ্বিতীয় অস্ত্র কষ্টসহিষ্ণু দৃঢ়কর্ম্মা শরীর। এই দুইটি অস্ত্র শাণিত করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ বীর সমরাঙ্গনে দাঁড়াইলে তাহার রণাস্ত্রেরঅভাব ধৃতচক্র বিষ্ণু আপনি ঘুচাইয়া দেন। অধর্ম্ম দলিয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতে হইলে অস্ত্রের বল চাই। এ সংসারে অহরহঃ ঘর্ঘর শব্দে কর্ম্ম-যন্ত্র ঘুরিতেছে; এ সময়ে নিরস্ত্র দুর্ব্বল জাতি মাত্রেই উৎসন্ন হইয়া যাইবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা ভারতবাসী রাজ আদেশে নিরস্ত্র! বিদেশী রাজা প্রাণের ভয়ে দেশব্যাপী প্রজাকে নিরস্ত্র করিয়াছে, পাছে প্রজা অত্যাচারের জ্বালায় ক্ষিপ্ত হইয়া রাজার মাথায় দণ্ডাঘাত করে। শিখ মরাঠা রাজপুত তৈলঙ্গীকে তবু ইংরাজ পল্টনে নিযুক্ত করিয়া সামান্য মাত্র রণকৌশল শিখায়, কিন্তু বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালী ও পুণা ব্রাহ্মণের আত্মরক্ষার্থে দীর্ঘ যষ্টিখানি পর্য্যন্ত ধারবার আদেশ নাই। কারণ বুদ্ধিশক্তি ও বাহুবল এক হইলে যে প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধরিতে পারে তাহাতে ইংরাজ রাজত্ব পলকে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে না তাহা কে বলিল? রাজা প্রাণভয়ে ধর্ম্মবিগর্হিত আইন করিয়াছে বলিয়া কি আট কোটী বাঙ্গালী ও বিংশ কোটীরও অধিক মরাঠা

রাজপুত প্রভৃতি অগণ্য বীর জাতি পশু হইয়া থাকিবে? প্রকাশ্য বৈধ উপায়ে যুদ্ধকৌশল ও কুচ কাওয়াজ শিখিবার অবসর আমাদের নাই বা রহিল। বাঙ্গালী যদি নিজের হস্তে এ শিক্ষার ভার লয়, তাহা হইলে অন্ততঃ স্বচেষ্টায় সাহস, বাহুবল, সহ্যশক্তি, অশ্বারোহণ-পটুতা প্রভৃতি বীরোচিত গুণ লাভ করিতে পারে এবং অধ্যয়ন ও প্রচারের দ্বারা দেশে রণনীতির সকল গূঢ় তত্ত্ব আয়ত্ব করিতে পারে। যদি কর্ম্ম প্রবণতার বলে বাঙ্গালী এত-দূরই করিল, তবে দুইটা সামান্য অস্ত্রের অভাব কখনও থাকিবে না। এই নূতন শিক্ষার ভিত্তি স্থাপনার জন্য এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। ইহার ফলে বন্দিনী মার রক্ত পদাম্বুজের একখানি শৃঙ্খলও যদি খসিয়া যায় তাহা হইলে মার অকৃতী পুত্র ধন্য হইবে।

ইংরেজ যে উদ্দেশ্যেই প্রজাকে নিরস্ত্র করিয়া রাখুক, আত্ম-রক্ষারজন্য প্রজাকে কতক পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকিতেই হয়। এই ইংরাজ জাতি যখন রোমক শাসনের অধীনে দাসত্ব করিতে ছিল, তখন রাজার স্কন্ধে আপনাদিগের রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিত বলিয়া অতিশয় দুর্ব্বল ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্য যখন রোমক শাসকগণ লুণ্ঠক জাতির উপদ্রব হইতে স্বদেশ রক্ষার জন্য ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইল, তখন নিঃসহায় হীনবীর্য্য ব্রীটন জাতি নানা পররাষ্ট্রহারী বিজয়ী জাতির পদানত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। এই জন্য যে দিক দিয়াই দেখা যাক, বীর্য্য সাহস অশ্বারোহণ দক্ষতা কৌশল ও সহিষ্ণু প্রভৃতি যোদ্ধসুলভগুণ এবং যথাসম্ভব রণনীতি জ্ঞান শিক্ষা একন্তই আবশ্যক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এ যুগের অস্ত্রের পরিচয়।

নূতন বন্দুক।

এক সময়ে সকল সভ্যতার শৈশব-শয্যা ভারতে রণ-বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হইয়াছিল। আজ এই অবনতি ও দাসত্বের দিনে সে উন্নতি অলীক পুরাণ-কথা বলিয়া বোধ হয়। শব্দভেদী, বায়ব, আগ্নেয়, সম্মোহন, বরুণ বা নাগ বাণের কাল আর নাই; আর্য্যদেশের পতনে মুনী, রাজর্ষি ও ধর্ম্মবীরের সহিত সে অনির্ব্বচনীয় বিজ্ঞানেরও লোপ ঘটিয়াছে। এমন কি রাজপুত আমলের লাঠি, তরবারি, বর্শা, বল্লম, তীর ধনুক ও খড়্গ কুঠারাদির ব্যবহারও প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এখন পরস্বাপহারক সভ্য ম্লেচ্ছ জাতিরা নব বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়াছে; নূতন করিয়া অল্পে অল্পে সেই কালাপহৃত লুপ্ত জ্ঞানের উদ্ধার করিতেছে, নূতন আকারে নূতন নামে পুরাতন অস্ত্রগুলি আবার চলিতেছে। ইউরোপ-খণ্ডে জার্ম্মান, রুষ ও ইংরাজ এবং এসিয়ায় নবোত্থিত জাপান এই নবীকৃত ধনুর্ব্বেদে সিদ্ধহস্ত।

পৌরাণিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিয়া ঐতিহাসিক মধ্য যুগের কথা ধরিলেও দেখা যায় যে, পূর্ব্বে অস্ত্রের অনেক প্রকার ভেদ

ছিল কিন্তু বর্ত্তমান অস্ত্রাদির ন্যায় সে সকল পুরাতন অস্ত্র এত মারাত্মক ও দূরগামী ক্ষেপকজাতীয় ছিল না। আজ কাল অস্ত্রের মধ্যে চারিটি প্রধান,—বন্দুক-গুলি, কামান-গোলা, বিস্ফুরক বোমা, ও সঙ্গিন। পুরাতন যুদ্ধোপকরণের মধ্যে কেবল মাত্র তরবারি ও বল্লমের ব্যবহারই আজও কিছু কিছু আছে।

প্রথমে বন্দুকের কথা বলি ;—বন্দুক প্রধানতঃ তিন প্রকার, গাদা বন্দুক (muzzle-loader), টোটা-বন্দুক (breach-loader) এবং রাইফেল বন্দুক (rifled gun)। গাদা বন্দুকের নলে বারুদ ও গুলি ভরিয়া রঞ্জুতমুখে (nipple) ফুল্লি (percussion cap) বসাইলে তবে আওয়াজ করা যায় ; এইরূপে প্রত্যেক বার গাদিতে ও আওয়াজ করিতে অনেক সময় লাগে। এই বাধা দূর করিবার জন্য টোটা বন্দুকের সৃষ্টি। টোটা-বন্দুকের কুঁদা (handle) ও নলের সংযোগস্থলের নিকটে কুঁদার উপর একটি হাতল (lever) আছে, ইহা টিপিয়া ইচ্ছাক্রমে কুঁদারদিকের তৎসহিত সংলগ্ন নলমুখ খোলা বা বন্ধ করা যায়। এই মুখ দিয়া নলে টোটা (Cartridge) প্রবেশ করাইয়া হাতল টিপিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিলেই বন্দুক ভরার কাজ হইল। বন্দুকের নলের মাপে তৈয়ারি একমুখ বন্ধ নলাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাপকে টোটার খাপ (Cartridge-Cell) বলে, এই খাপের মধ্যে বারুদ ও গুলি ভরা থাকে এবং বন্ধ মুখের মধ্যভাগে ক্যাপ বা ফুল্লি লাগান থাকে ; ইহারই নাম টোটা। টোটা-বন্দুকে বারুদ ও গুলি পৃথক পৃথক ভরিতে হয় না, বলিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত মিনিটে আট দশটি পর্য্যন্ত আওয়াজ করা যাইতে পারে। কিন্তু বন্দুক গাদাই হউক বা টোটাদারই হউক ইহার পাল্লা অধিক দূর নহে। বন্দুকের পাল্লা বা গুলির

গতি (range) বাড়াইবার জন্য রাইফেল বন্দুকের (rifled gun) সৃষ্ট হইয়াছে। রাইফেলের নলের ভিতরের গায়ে স্ক্রুর প্যাঁচের ন্যায় প্যাঁচ কাটা থাকে, এই জন্য গুলি নল হইতে বিষম জোরে ঘুরিতে ঘুরিতে বাহির হয় এবং বহুদূরে যাইয়া পড়ে; এই জন্য সচরাচর রাইফেলের পাল্লা ৬০০।৭০০ গজ অবধি হইতে দেখা যায়।

সর্ব্বাপেক্ষা নূতন গঠনের রাইফেলে ঘোড়ার (trigger) নীচে কুঁদার মধ্যে পথ আছে, এবং নলের নিম্নে তৎসংযুক্ত একটি মুখবন্ধ নল থাকে। তাহাতে একেবারে দশ বারটি টোটা লাগান যায় এবং একটি আওয়াজ হইবার পর কল টিপিলেই ব্যবহৃত টোটা বাহিরে পড়িয়া গিয়া নূতন টোটা তাহার স্থান অধিকার করে এবং ঘোড়া স্বতই উঠিয়া বন্দুক পুনরায় আওয়াজ করিবার উপযোগী হয়। এই প্রকারের রাইফেলকে ম্যাগাজীন-রাইফেল বলে; ইহাই বর্ত্তমান যুদ্ধের বন্দুক। রাইফেল অনেক প্রকার আছে, তন্মধ্যে জার্ম্মানীর "মসার" ও জাপানের "আরিসাকা" রাইফেলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার পাল্লা এত অধিক যে গুলি এক বা দুই মাইল অবধি যায়। তিনটি কারণে রাইফেলের পাল্লা এত বাড়িয়াছে। প্রথমতঃ মসার বা আরিসাকা রাইফেলের নলমুখ অল্পপ্রসার ও ক্ষুদ্র, নলের চৌঙ্ সরু হইলে বারুদের গ্যাস অল্প স্থানে আটকা পড়ে এবং গুলি বিষম জোরে বহুদূরে লইয়া ফেলে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বের কালো বারুদের (Black-powder) অপেক্ষা বর্ত্তমান রাইফেলের টোটার বারুদ অনেক অধিক তেজশালী ও শক্তিমান; অগ্নি সংযোগে ইহাতে ধূম মাত্র হয় না এবং রাইফেলের নলে কোন প্রকার ময়লা পড়ে না।

"The old powder was a *mechanical* mixture of nitre, sulphur and charcoal upon the ignition of which were liberated many elements which did not enter into new combinations. The new powder is a *chmeical* combination which gives scarcely any smoke and produces no empyreuma in the barrel. At the same time the explosive force of the new powder is much greater than that of the old," এই নূতন বারুদের বিস্ফুরণ ক্ষমতাও পুরাতন বারুদের অপেক্ষা বহুগুণে অধিক। ধূম-হীনতা বশতঃ এই বারুদ ব্যবহারের ফলে রাইফেলধারী সৈন্য সহজেই প্রচ্ছন্ন থাকিয়া গুলি চালনা করিতে পারে, এবং চক্ষের সম্মুখে ধূমপুঞ্জ জমিয়া আর তাহার লক্ষ্যের ব্যাঘাত জন্মায় না। জাপানের শ্রেষ্ঠ রণ-বিজ্ঞানবিদের নাম ডাক্তার শিমোজ, ইনিই জগদ্বিখ্যাত শিমোজ বারুদের আবিষ্কর্ত্তা। এই বারুদের ন্যায় লোকক্ষয়কারী ভীষণ পদার্থ আর জগতে দ্বিতীয় নাই। আরি-সাকা রাইফেলে এই উৎকৃষ্ট বারুদ ব্যবহার হয় বলিয়াই ইহার এত শক্তি।

রাইফেলের পাল্লা বাড়িবার তৃতীয় কারণ, ইহার নলের প্যাঁচ। এ বিষয়ের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি।—মশার ও আরিসাকা রাইফেলের ওজন দেড় হইতে দুই সেরের অধিক নহে, সুতরাং ইহা স্কন্ধে লইয়া ২০।২৫ মাইল কুচ (march) করিতে সিপাহীর কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। রাইফেলের নল অল্প-প্রসার বলিয়া ইহার কার্ত্তুজও লম্বা এবং পেন্সিলের ন্যায় সরু হয়। পূর্ব্বে ভারী টোটা-বন্দুকের ভারী কার্ত্তুজ ৬০টা বহিতে

শিপাহীকে শ্রান্ত হইতে হইত; কিন্তু এখন রাইফেলের ৩৮০টি হালকা কার্তুজ বহিতে একজন শিপাহীর বিশেষ কোন কষ্ট হয় না। রাইফেলের উপর মাপকাটি ও মাছি আছে, তাহার দ্বারা ইচ্ছামত ৫০০ বা ১০০০ গজ দূরে লক্ষ্য করিয়া (Sighting the gun) গুলি দাগা যায়। ম্যাগাজিন রাইফেলে এত ক্ষিপ্রগতিতে কার্য্য হয় যে, মিনিটে সচ্ছন্দে ৬০ বার আওয়াজ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত তিনটি কারণে রাইফেলের পাল্লা ও গুলিগতি বৃদ্ধি হওয়ায় গুলিগতির বিষয়ে একটি অভিনব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে গাদা বন্দুকে গুলি নল ত্যাগ করিবার পর উর্দ্ধে উঠিয়া তবে ক্রমে ক্রমে নামিয়া আসিত, সুতরাং গুলি ভূমি সন্নিহিত না হওয়া অবধি কাহাকেও আঘাত করিত না। কিন্তু বর্ত্তমান রাইফেলের ক্ষেপন শক্তি অনেক অধিক বলিয়া নলমুখ ত্যাগ করিয়া গুলি উর্দ্ধে উঠে না, ঋজু সমান্তরাল রেখায় ছুটিতে থাকে; সুতরাং সেই গতির মধ্যে এক মাইল পথে যাহা পায় তাহাই বিদ্ধ করিয়া যায়। মসারের গুলিকে পরে পরে সাতটি মৃত জন্তু ভেদ করিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

নানা প্রকার রাইফেলের মারাত্মিকা শক্তি তুলনা করিয়া জনৈক অস্ত্রবিৎ তাহা বুঝাইবার জন্য কতকগুলি বিভিন্ন রাইফেল-শক্তিকে অঙ্কে পরিণত করিয়াছেন। কিরূপ ভীষণ গতিতে রাইফেলের হনন শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে এই সংখ্যাগুলি তুলনা করিয়া দেখিলেই তাহা কতক পরিমাণে উপলব্ধি করা যায়। সংখ্যা গুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল:

বর্ত্তমান ফরাসী রাইফেল—৪৪৩

জার্ম্মান রাইফেল—৪৭৪

বর্ত্তমান ইতালীয় এবং স্পেনীয় রাইফেল—৫৮০
„ যুক্তরাজ্যের ৬ মিলি* রাইফেল—১০০০
„ ৫ মিলি রাইফেল— ১৩৩৭

বুয়ার সমরে ইংরাজ পক্ষের সৈন্যদিগের হস্তে ক্যারাবিন বন্দুক এবং M ৯৫ ·৩০৩ ইঞ্চি লি মেটফোর্ড রাইফেল ছিল, ইহার গুলির গতিশক্তি সেকেণ্ডে ২০০০ ফিট, মাপকাটির দ্বারা ইহা ২৭৫০ গজ অবধি লক্ষ্যোপযোগী করা (Sighted) থাকে এবং ইহার কার্ত্তুজের ঘরে একে একে দশটি অবধি টোটা ভরিয়া রাখা যায়। কিন্তু বুয়ারদিগের হস্তে ইহা হইতেও শক্তিশালী ·২৭৫ ইঞ্চি মসার এবং কখন কখন হেন্‌রি মার্টিনী রাইফেলও থাকিত। এই সকল অস্ত্রাদি বুয়ার প্রজাতন্ত্র ইউরোপ হইতে আমদানি করিয়া রাখিয়াছিল, এবং যুদ্ধ ঘোষণার পরও প্রচুর অস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের সাহায্যে ইংলণ্ড হইতে গুপ্তভাবে প্রেরিত হইত। সমরের শেষভাগে উৎকৃষ্ট বারুদের অভাব ঘটায় বুয়ার যোদ্ধগণ হেন্‌রি মার্টিনী রাইফেলে সামান্য কালো বারুদও (Black powder) ব্যবহার করিয়াছিল। অনেক সময়ে আততায়ী ইংরাজের উপর জাতক্রোধ হইয়া তাঁহারা কার্ত্তুজের গুলি

---

* রাইফেলের নলের রন্ধ্র যত ক্ষুদ্র হয়, রাইফেল তত উৎকৃষ্ট জাতীয় হয়। এই রন্ধ্র বৃত্তাকার, ইহার কেন্দ্র ভেদ করিয়া এক দিকের পরিধি হইতে পরিধির অংশান্তরে বিস্তৃত ব্যাসেরই দৈর্ঘ্যানুসারে রাইফেলের নামকরণ হয়; milimitre এই ব্যাসের মাপ বিশেষ, সুতরাং ·৫ এম্, ·৬ এম্, ·৪ এম্ ইত্যাদি এই দৈর্ঘ্যানুযায়ী রাইফেলের নাম মাত্র।

স্থূলাগ্র [⊂⊃—] আকারে কাটিয়া লইতেন; এই প্রকার আকৃতিবিশিষ্ট গুলি অস্থি বা মাংসে বিদ্ধ হইলে তাহা বাহির করা বড় কঠিন; গুলি যত বড় অন্ততঃ তাহার দ্বিগুণ ক্ষত না করিলে সেই স্থূলাগ্র গুলি নিষ্ক্রামণ করা যায় না। দমদমগুলি ইহা হইতেও অধিক মারাত্মক। এই গুলির ভিতর স্ফুরক পদার্থ থাকে, সেই জন্য ইহা শরীরে বিদ্ধ হইবার পর ভিতরে ফাটিয়া অস্থি চূর্ণ করিয়া দেয় এবং গুলি গলিয়া বৃহদাকার হওয়ায় চিকিৎসকের পক্ষে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াও তাহা বাহির করা দুর্ঘট হয়। কিন্তু ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে যে আন্তর্জাতিক সমর-বিধি (International law of war) প্রচলিত আছে, তদনুসারে এই গুলি ইউরোপীয় সেনার সহিত ইউরোপীয় সেনার যুদ্ধকালে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ আছে।

—*—

নূতন কামান।

পূর্ব্বে কামান তৈয়ারী হইত অজগরের ন্যায় স্থূল ও প্রকাণ্ড; তাহার নলের মুখ এত বিস্তৃত যে তাহার মধ্যে কুকুর বিড়াল স্বচ্ছন্দে চলিয়া বেড়াইতে পারিত। বিষ্ণুপুরের রাজার বড় কামানের নাম দলমাদল; তাহার রন্ধ্রমুখ ইংরাজেরা আজ কাল শিশা ঢালিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ইহার মধ্যে একবার দুইটি ভল্লুকে বাসা করিয়াছিল। প্রবাদ এইরূপ যে বর্গির হাঙ্গামার সময়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই কামান দাগিয়া রণে মারাঠাদিগকে পরাজিত করেন।

এই সকল পুরাতন বড় কামান কাঁচা লোহা বা দেশীয়
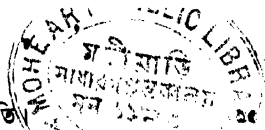
ইস্পাতে তৈয়ারী হইত। দাগিবার সময়ে ইহাতে শিশার নিরেট গোলা এবং গন্ধক সোরা ও কয়লার মিশ্রণে প্রস্তুত কালো বারুদ ব্যবহার হইত। কালো বারুদ বিশেষ তেজবান পদার্থ নহে; বিশেষতঃ অত বৃহৎ নলে বারুদের গ্যাস ছড়াইয়া পড়ায় ভারি গোলা বহুদূরে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে না।

আজ কাল ঢালাই করা নিকেল ইস্পাতে, বা গোছা গোছা তার জড়াইয়া পিটিয়া কামানের নল তৈয়ারী করা হয়। ইহার নল আধুনিক রাইফেলের নলের ন্যায় লম্বা ও অল্পপ্রসার। এই জন্য এ যুগের অতি-বৃহৎ কামানও ওজনে ১১।১২ মণের অধিক হয় না। বর্ত্তমান যুদ্ধে যে কামান ব্যবহৃত হয় তাহার অনেক প্রকারভেদ আছে। সমতল ক্ষেত্রে বা সচরাচর যুদ্ধস্থলে যাহা ব্যবহার করা হয় তাহাকে ক্ষেত্র-কামান বা field artillery বলে; উচ্চ দুর্গাদি বা তুঙ্গ গিরিমালায় অবস্থিত শত্রুকে স্থান-চ্যুত বা উৎসন্ন করিতে হইলে ১১ ইঞ্চি নৌ-কামান (11 in. naval guns) অথবা ঊর্দ্ধক্ষেপী Howitzer কামানই কার্য্যকরী হয়; এই সকল অবরোধক কামানের (Seize-guns) গোলা অতি উচ্চে উঠিয়া লক্ষ্য স্থানে পতিত হয় এবং ফাটিয়া গিয়া লৌহ চূর্ণে ধূমে ও অগ্নিতে বহু সৈন্য নষ্ট করে। ক্ষেত্র-কামানের মধ্যেও আবার নানা প্রকারভেদ আছে, যথা দ্রুতক্ষেপী (Quick-firer), লঘুভার (Light artillery), পম্‌পম্‌, যান্ত্রিক (Machine Guns) ইত্যাদি।

কামান আজকাল দুই চাকা বা চারি চাকার গাড়িতে বসান থাকে, এবং কামানের ওজন অনুসারে চার হইতে বারটি পর্য্যন্ত ঘোড়ায় তাহা টানিয়া লইয়া যায়। কামান সাজাইয়া

দূরত্ব বুঝিয়া লক্ষ্য করিবার জন্য কামানের সহিত নানা প্রকার যন্ত্র মাপকাঠি ও দূরবীক্ষণ থাকে। নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও উপায় আবিষ্কৃত হওয়ায় দ্রুতক্ষেপী কামান (quick firer) আজকাল আর প্রতিনিয়ত বদলাইতে হয় না, এবং তোপশ্রেণী হইতে মিনিটে বিশ বার করিয়া গোলাধারা (rounds) বর্ষণ করা যাইতে পারে। গোলা নলমুখ হইতে বাহির হইবার সময়ে কামান আর পিছু হটিয়া ধাক্কা দেয় না, তজ্জন্য গোলন্দাজগণকে রাইফেলের গুলি এবং লঘুভার (Light artillery) বা ক্ষেত্র কামানের উপর একপ্রকার ঢাল সংযুক্ত করা সম্ভব হইয়াছে; কেবলমাত্র ঊর্দ্ধক্ষেপী (Howitzer) কামানের গোলাই উচ্চ হইতে পড়িয়া এই ইস্পাতের ঢালযুক্ত কামানকে সহজে নষ্ট করিতে পারে।

কামানের উপরিস্থ ঢাল কামান রক্ষার বিশেষ উপযোগী। রণনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ১০০ শেল অব্যর্থ হস্তে লক্ষ্যে না পঁহুছিলে একটি ঢালযুক্ত কামান-বহর (Artillery) ধ্বংস করা যায় না। তবে জাপানী গোলন্দাজের ন্যায় দক্ষ শ্যেন-দৃষ্টি গোলন্দাজ হইলে অবশ্য যে কোন তোপের দ্বারা কামান অকর্ম্মণ্য করিতে পারে।

নানা প্রকার যন্ত্র তন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে গোলন্দাজ লক্ষ্য-স্থান চক্ষে না দেখিতে পাইলেও অব্যর্থ হস্তে তথায় গোলা দাগিতে পারে। এক দল চর-সৈন্য (Observing party) প্রত্যেক কামান বহরের সহিত থাকে, ইহারা কিয়দ্দূর হইতে চীৎকার করিয়া শত্রুর গতিবিধি অনুসারে লক্ষ্যের দূরত্ব ও দিক বলিয়া দেয়, এবং সেই উপদেশ অনুসারে পর্ব্বত বা স্তূপান্তরালে

লুক্কাইত গোলন্দাজগণ গোলা চালায়। কামান-বূহর হইতে বহু দূরে থাকিয়াও চরদল ধ্বজ-সঙ্কেত (flag signalling) বা আলোক সঙ্কেতের (Heliograph) সাহায্যে গোলন্দাজ-গণের উপর হুকুম চালাইতে পারে। সুতরাং শক্রর অলক্ষ্য স্থানে গুপ্ত রহিয়া এই চর সৈন্যই গোলন্দাজদিগের চক্ষুর কর্ম্ম করে।

কামানের গোলা আজ কাল আর নিরেট বা ফাঁপা লোহার পিণ্ডমাত্র নহে। আজ কালকার গোলাকে শেল বা শ্রেপনেল বলে। নাইট্রো গ্লিসারিন, ফালমিনেট অব মার্কারি, পাইর-ক্লিলিন, লিডাইট, কর্ডাইট প্রভৃতি অনেক প্রকার বৈজ্ঞানিক মিশ্রিত পদার্থ আছে, এই সকল পদার্থ বারুদ হইতে অনেক অধিক শক্তিশালী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড লিডাইট বা পাইরক্লি-লিনের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইস্পাতের ফাঁপা গোলার মধ্যে ভরিয়া কামানে দাগিলে তাহা শক্রর মধ্যে পড়িয়া ফাটিয়া যায়। ইহাকেই শেল বা শ্রেপনেল বলে। ফাটিবার সময়ে শেলের আবরণটিও চূর্ণ হইয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত হয়; এই সহস্র সহস্র লৌহ খণ্ডগুলি রাইফেলের গুলির মত বেগে চারিদিকে ছুটিতে থাকে; এবং যুগপৎ বহুসংখ্যক লোককে সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত করে।

শ্রেপনেল গোলা তোপনল হইতে বাহির হইয়া যে পথে চলে তাহাকে গোলার গতিপথ (Trajectory) বলে। গোলা নলমুখ ত্যাগ করিয়া এই গতিপথের যে কোন স্থলে ফাটিতে পারে; ফাটিবার পরও তাহার সহস্র সহস্র খণ্ডনিচয় অবিদীর্ণ গোলার তুল্য মহাবেগে ক্রমেই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর চক্রাকারে

ছড়াইতে ছড়াইতে চলিতে থাকে। সুতরাং শ্রেপনেল গোলা দাগিতে বিশেষ অব্যর্থ লক্ষ্যের আবশ্যক হয় না।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রুসীয় সমরে প্রথম চার পাউণ্ডার শেল (দুইসের) ব্যবহার করা হইয়াছিল। আজ কাল যে ১৮ পাউণ্ডার শেলযুক্ত (৯সের) ক্ষিপ্রশক্তি কামান ব্যবহৃত হয়, তাহা চার পাউণ্ডার কামান অপেক্ষা ৬০ গুণ অধিক মারাত্মক। বিরাট অতিকায় নৌ-কামানে যে শেল ব্যবহৃত হয় তাহার ওজন ৫০০ পাউণ্ড অথবা প্রায় ৬৴মন; ইহা এক একটি ক্ষুদ্র বারুদাগার (Magazine) বিশেষ। রুষ জাপান সমরের ঐতিহাসিক বর্ত্তমান শেলের মারাত্মক শক্তির বিষয়ে বলিয়াছেন, "The effect of a single shell from a 12 inch gun is appalling. Eight hundred and fifty pounds of metal with a bursting charge capable of rending it into countless fragments the smallest of which may cause frightful mutilation." "১২ইঞ্চি কামানের একটি মাত্র শেল ফাটিয়া যে ১১৴মন লৌহ খণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে, তাহার সামান্য একটি টুকরায় মানুষকে অতি সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত করিতে পারে।"

পোর্ট আর্থার অবরোধের সময়ে যখন জাপানীরা মিটার রেঞ্জ (Metre range) শিখর হস্তগত করিবার আয়োজন করিতেছিল, তখন এই ৬৴ মোণী গোলার আঘাতে সেই শিখরস্থ অগণ্য রুষ সৈন্যের তিন জন মাত্র জীবিত ছিল এবং গিরিগাত্র চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ব্রিজা শেল এত প্রলয়ঙ্কর শক্তিবিশিষ্ট, যে তাহার টুকরা গায়ে না লাগিলেও তাহার ফাটিবার ধাক্কায় মানুষ মরিয়া যায়। বৈজ্ঞানিক শেল-বারুদ ফাটিয়া যে বিষাক্ত

গ্যাস বাহির হয় তাহাতেও মানুষ মরিতে পারে? একটি শেলকে ৩৩০০ গজ দূর হইতে আসিয়া শত্রু সৈন্য হইতে ২২০ গজ দূরে পড়িয়াও ফাটিবার ধাক্কায় বহু লোক আহত করিতে দেখা গিয়াছে।

এক হাজার রাইফেল হইতে গুলি চলিতে আরম্ভ করিলে যে পরিমাণ স্থান ছাইয়া তাহার মারাত্মক ক্রীড়া হয়, একখানি মাত্র শেল ফাটিলে ততখানি স্থানের মধ্যে তেমনি বিষম অগ্ন্যুদ্গম ঘটে। একটী শ্রেপনেল্ ফাটিয়া ৩৪০টি ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত হয় এবং ৮৮০গজ লম্বা এবং ৪৪০ গজ পরিসর স্থান ব্যাপিয়া বৃষ্টিধারার ন্যায় বর্ষিত হয়। শেল শ্রেপনেল বা বোমা ফাটিয়া কত অংশে বিভক্ত হয় নিম্নে তাহার অনুপাত দেওয়া গেল।

একটী শেল	২৪০ খণ্ড।
একটি শ্রেপনেল	৩৪০ খণ্ড।
একটি পুরাতন কালো বারুদে ভরা বোমা	৪২ খণ্ড।
(ওজন ১/০ মণ)	
একটি পাইরক্সিলিনে ভরা লোহার বোমা	১২০৪ খণ্ড।
(ওজন ১/ মণ)	

বর্ত্তমান কামান এক ভীম শক্তির আধার। ইহার গোলা দশ বার মাইল, কোন কোন কামানে বা ১৫।২০ মাইল অবধি যায়। কামানের গোলা সোজা পথে চলে না, অতি উচ্চে উঠিয়া তবে মাটিতে পড়ে। এক উচ্চ গিরিশৃঙ্গের এক পারে কামান পাতিলেও সেই শৃঙ্গের অপর পারে দশ বার মাইল দূরবর্ত্তী যে কোন স্থানে গোলা দাগিতে পারা যায়। কামান গিরি বা স্তূপের অন্তরালে পাতিবার ইহা ব্যতীত আরও একটি কারণ আছে।

ধূমহীন বারুদে কামান দাগিলে তজ্জনিত জ্যোতি বড় তীব্র হয়, সুতরাং শত্রুর চক্ষু হইতে কামানশ্রেণী লুকাইয়া রাখিতে হইলে কামানের সন্মুখের ভূমি ১৩।১৪ ফিট অন্ততঃ উচ্চ হওয়া উচিত। আকাশের তাৎকালীন অবস্থা, তোপ বুরুজের সন্নিহিত জমির অবস্থা প্রভৃতির উপর এই অগ্নি-জোতির উজ্জ্বলতার তারতম্য নির্ভর করে। গোলা দাগিবার সময়ে জমি হইতে যে ধূলার মেঘ উঠে, তাহা নিবারণ করিবার জন্য তোপবুরুজের সন্নিহিত ভূমি জলসিক্ত রাখিতে হয় বা তাম্বুর মোটা কাপড়ে (Canvas) ঢাকিয়া দিতে হয়।

বিস্ফুরক বোমা, সঙ্গিন এবং বল্লম।

বন্দুক ও কামান ক্ষেপক জাতীয় অস্ত্রবিশেষ। স্ফুরক অস্ত্রের (Explosives) মধ্যে বোমাই প্রধান। বোমা মোটা মুটি তিন প্রকারের হয়, যথা টরপেডো (Torpedo) বা পোতঘ্ন বোমা, সামুদ্রিক বা জল বোমা (Marine mines) এবং স্থল বোমা (Land mines)। পোতঘ্ন বোমা নৌ-যুদ্ধের মহাস্ত্র বিশেষ। আজ কাল শেল ও শ্রেপনেল এত ভীমশক্তি হইয়াছে, যে, সে প্রকার ক্ষেপকাস্ত্রের (Projectiles) সন্মুখে কাষ্ঠের রণতরী দুই এক মুহূর্ত্তেই শতছিদ্র হইয়া যায়। এইজন্য বর্ত্তমান রণতরীগুলি ১২ ইঞ্চি প্রস্থ ইস্পাতের পাতে মণ্ডিত থাকে। এই প্রকার লৌহময় রণপোত ধ্বংস করিবার জন্যই পোতঘ্ন বোমার সৃষ্টি। Phosphor-bronze নামক ধাতুর তৈয়ারি একটি চুরুটের

(Cigar) আকৃতিবিশিষ্ট নলে ১৫।১৬ সের হইতে ৬ মণ অবধি পরিমাণে গানকটন, ডিনামাইট অথবা সিমোজ বারুদের তুল্য কোন প্রকার তেজবান বিস্ফুরক পদার্থ ভরিয়া এই পোতঘ্ন বোমার সৃষ্টি হয়। ইহার মুখাগ্রে এক প্রকার স্পন্দন যন্ত্র থাকে, যাহার সাহায্যে এই বোমা ১৫ফিট পর্য্যন্ত জলের তলে ঋজু রেখায় চলিতে থাকে। আজ অবধি যত প্রকার টরপেডো আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে White head বোমাই শ্রেষ্ঠ।
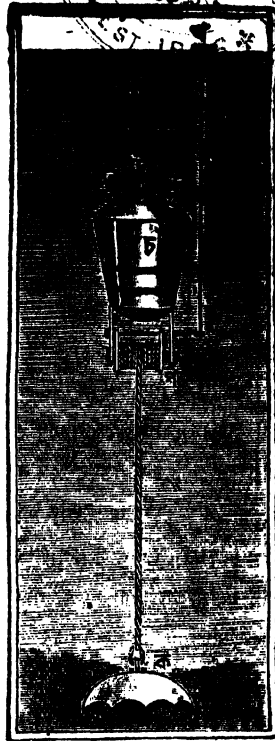
জল বোমা বা মাইন।

ক। নঙ্গর; খ। যন্ত্র ভাসমান রাখিবার জন্য বায়ু-কোষ; গ। রজ্জু জড়ান দণ্ড; চ। স্ফুরকপদার্থপূর্ণ আধার; ট। তিনটী তীক্ষ্ণ স্ফুরকভেদকারী যষ্টি।

১.১৬শ ইঞ্চি স্থূল ইস্পাতের পাতে মণ্ডিত পোতঘ্ন তরী (Torpedo

boat) আছে, ইহার তলদেশে জলনিম্নে ইহার একাংশ এরূপ সুকৌশলে নির্ম্মিত যে তাহাতে জল প্রবেশ করে না, অথচ ইচ্ছা-মত ডুবায়া শত্রুতরী লক্ষ্যে পোতঘ্ন বোমা দাগা যায়। এই যন্ত্রের নলমুখ হইতে ভীষণ বলে চালিত হইয়া পোতঘ্ন বোমা শত্রু তরী লক্ষ্যে ছুটিয়া চলে, এবং তলদেশে ভীম নাদে ফাটিয়া লৌহময় বিরাট রণপোতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেয়। বোমা শত্রুতরীকে আঘাত করিতে না পারিলে নির্দ্দিষ্ট পথ অবধি যাইয়া আপনি ডুবিয়া যায়। যে পোতঘ্ন বোমা লইয়া নৌ সেনারা বোমা চালনা শিক্ষা (Practice) করে তাহা নির্দ্দিষ্ট দূর অবধি যাইয়া ভাসিয়া উঠে।

রণতরীকে শত্রুর পোতঘ্ন বোমার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য রণ-পোতের তলে লৌহজাল ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তরীর গতিশীল অবস্থায় এ প্রকার জাল কার্য্যকরী হয় না।

পোতঘ্ন বোমা গতিশীল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ইহা আক্রমণের অর্থাৎ আততায়ীরই (offensive) অস্ত্র, কিন্তু সামুদ্রিক বোমা (Submarine mines) এবং স্থল-বোমা স্থিতিশীল; ইহা বন্দর-মুখ বা দুর্গের চতুর্দ্দিক রক্ষার জন্যই ব্যবহৃত হয়, সুতরাং ইহা আত্মরক্ষার (Defensive) উপকরণ বিশেষ। কি সামুদ্রিক বোমা কি স্থল-বোমা উভয়েরই গঠন-নির্ম্মাণ পদ্ধতি এবং প্রকার-ভেদ প্রায় এক। তবলা নামক বাদ্যযন্ত্রের আকৃতিবিশিষ্ট আধারে শক্তিমান স্ফুরক পদার্থ ভরিয়া এই বোমার সৃষ্টি হয়। ১৫। ১৬ সের স্ফুরক পদার্থ দ্বারা যে ক্ষুদ্র বোমা তৈয়ারী হয়, তাহা রণতরীর লৌহবর্ম্মে সহজেই একটি নাতিদীর্ঘ ছিদ্র করিতে পারে; কিন্তু ৬। ৭ মণ স্ফুরক পূর্ণ বৃহদাকার বোমার আঘাতে

পোতঘ্ন বোমা বা টরপেডো

ক। সঙ্কুচিত বায়ুর কোষ; খ। পোতঘ্ন বোমাকে ঋজু ভাবে রাখিবার যন্ত্রাদি; গ। পোতঘ্ন বোমাকে ভাসাইয়া রাখিবার যন্ত্রযুক্ত কোষ; স্ফুরকাধার; খ ও গ ঘর মধ্যস্থিত এঞ্জিন কোষ।
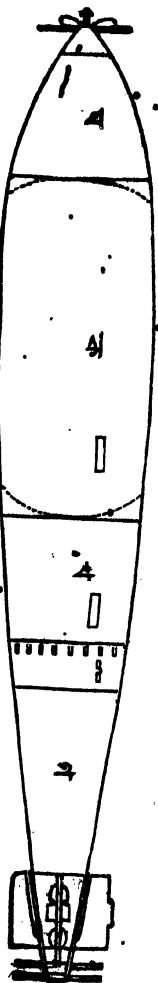
রণতরীর একাংশ চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। সিমোজ বারুদের দ্বারা জাপানী সেনানী কাপ্তেন্ অডা এক প্রকার মাইন তৈয়ারী করিয়াছেন।

মাইন আকারে একটি বৃহৎ নারিকেলের ন্যায়, এবং ইহাতে একখণ্ড তারসংযোগে একটি লোহার কাঁটা ঝুলিতেছে। ইহা সমুদ্রে ফেলিয়া দিলে জলের সাত আট হাত নীচে ভাসিতে থাকে। যখন কোন রণতরী সেই পথে যাইবার সময়ে এই মাইনে স্পর্শ করে তখন ইহা ফাটিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দশ বার ইঞ্চি মোটা ইস্পাতে মণ্ডিত রণতরিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেয়। এই মাইন জাপানীরা পোর্ট আর্থার বন্দরের মুখে ফেলিয়াছিল, তদ্দ্বারা রুষদিগের বহু Cruiser তরী, Torpedo destroyer তরী এবং একখানি পেট্রোপ্যাভলস্ক নামক উৎকৃষ্ট রণতরী নষ্ট হইয়াছিল। একমাত্র এই পেট্রোপ্যাভলস্ক তরী নির্ম্মাণ করিয়া যুদ্ধোপকরণে সাজাইতে প্রায় দেড় ক্রোর টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

সামুদ্রিক বোমা প্রধানতঃ তিন প্রকারের হয়, বহিঃসংযোগ, অন্তঃসংযোগ এবং স্বতঃক্রিয়। বহিঃসংযোগ বোমা নির্দ্দিষ্ট স্থানে জলে ডুবাইয়া দূরে কোন নিভৃত স্থানে তৎসংযুক্ত তড়িৎসঞ্চারী তার ধরিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। শত্রুর রণতরী যখন এই বোমাকীর্ণ স্থানে আসে তখন সেই তার বিদ্যুৎ যন্ত্র (Battery) স্পর্শ করিলেই তাড়িতোদ্ভূত অগ্নিকণায় বোমা মহানাদে ফাটিয়া ছিদ্রীকৃত রণতরী জলমগ্ন করে। অন্তর্সংযোগ বোমা এইরূপ কৌশলে তৈয়ারী যে রণপোতের তলদেশ তাহার উপর আঘাত করিলেই বোমার গর্ভে বিদ্যুৎ সঞ্চারী তার যন্ত্র সংযুক্ত হইয়া অগ্নি প্রসব করতঃ বোমা বিদীর্ণ

স্থল বোমার ক্রিয়া।

করিয়া দেয়। স্বতঃসংযোগ বোমাও আঘাত পাইলেই ফাটিয়া যায়; কিন্তু ইহাতে বিদ্যুতের (Electricity) সম্পর্ক নাই। তৎ-পরিবর্ত্তে বোমার উদরে এরূপ দুইটি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদার্থ (sulphuric acid এবং chlorate of potass) পৃথক ভাবে ও সুকৌশলে রাখা হয়, যে আঘাতের ফলে উভয় পাত্র ভাঙ্গিয়া বৈজ্ঞানিক পদার্থ দুইটি মিশ্রিত হইলেই তাহাতে অগ্নি উদ্দীপ্ত হয়; এই অগ্নি স্পর্শে স্ফুরক পদার্থ জ্বলিয়া বোমা ফাটাইয়া দেয়। ইহা ব্যতীত আরও নানা বিভিন্ন কৌশলে স্বতঃসংযোগ বোমা তৈয়ারী করা হয়।

স্থল বোমার প্রস্তুত প্রণালীও এইরূপ; কেবল তাহা জলে ব্যবহার না হইয়া স্থল-যুদ্ধে দুর্গ বা ব্যূহ (fortification) রক্ষায় নিয়োজিত হয়। ব্যূহের চতুর্দ্দিকে খাত পরিখা প্রভৃতি যে উদ্দেশ্যে খনিত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই ভূগর্ভে বোমা প্রোথিত থাকে। শত্রু ব্যূহ আক্রমণ করিতে আসিলে তাহাদিগের পদস্পর্শে এই ভূগর্ভস্থ বোমা ফাটিয়া বহু সৈন্য নাশ করে।

পূর্ব্বে বহুদূরগামী ক্ষেপকাস্ত্র ছিল না বলিয়া যুদ্ধকালে উভয় সেনার সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ অনিবার্য্য ছিল, তাই অসি, বল্লম, খড়্গ, কুঠার প্রভৃতির সাহায্যে যুদ্ধ জয় হইত। আজ কাল দূরগামী ক্ষেপকাস্ত্রের তাড়নায় উভয় সেনা পরস্পরের সন্নিহিত হইতে পারে না। কিন্তু যখন সন্নিহিত হয় তখন সঙ্গীনই অধিক ব্যবহারে আসে। আত্মরক্ষী পক্ষের (defensive side) গুলির ভয়ে আততায়ী দলকে (offensive side) ঘনসম্বদ্ধ রেখা ছাড়িয়া পাতলা রেখায় আক্রমণ করিতে হয়; এই জন্য বল্লম বা অসি সুফলদায়ী হয় না। বিশেষতঃ সঙ্গীন ক্ষুদ্র, লঘু

সূচিমুখ ও বিদ্ধনোপযোগী, সুতরাং বর্ত্তমান রণনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহারই উপযোগিতা অধিক বলিয়া মনে করেন। গত রুষ জাপান যুদ্ধে জাপানীরা দীর্ঘফলক অসি (broad sword) দুই একবার আক্রমণ কালে ব্যবহার করিয়াছিল। কসাক অশ্বারোহী ও বিলাতি লান্সারস্ সৈন্যদলের হস্তে বল্লম থাকে বটে, কিন্তু চরবৃত্তি বা প্রহরাকার্য্য ব্যতীত প্রকৃত যুদ্ধে ইহার ব্যবহার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।
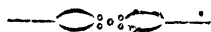
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সজ্জা ও সেনা বিভাগ।

যে স্থানে যুদ্ধ ঘটিতেছে অর্থাৎ উভয় সেনার সংঘর্ষে আক্রমণ, প্রত্যাহরণ, অগ্নিক্রীড়া ও চরসৈন্য-সঞ্চার প্রভৃতি রণঘটিত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্র (battle field) বলে। কিন্তু যুদ্ধভূমি ইহা হইতেও বিশালতর ; যে দেশে বা দেশাংশে আততায়ী সেনা আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে, একটি মহাযুদ্ধের (war) সমাপ্তি পর্য্যন্ত যতখানি স্থান ব্যাপিয়া খণ্ড-যুদ্ধ (battle) ঘটিবার সম্ভাবনা আছে এবং যে দেশ বা দেশাংশ উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির করতলগত ও হস্তগত করিবার লক্ষ্যীভূত, সেই স্থানকে (theatre of war) যুদ্ধভূমি বলে। যুদ্ধক্ষেত্র ও যুদ্ধভূমি থাকিলেই তাহার জন্য কোন এক নেপথ্য ভূমি (base of war) থাকা আবশ্যক ; যুদ্ধভূমি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কিয়দ্দূরবর্ত্তি এবং যুদ্ধভূমির অন্তর্গত যে স্থানকে কেন্দ্র করিয়া যুদ্ধার্থে প্রেরণের জন্য সৈন্য, সেনানী, রসদ (commiserjate) এবং যুদ্ধোপকরণ (ammunition and war materials) সঞ্চিত হয়, তাহারই নাম নেপথ্যভূমি। কখন কখন এই নেপথ্যভূমি (base of war) যুদ্ধভূমির (theatre of war) বাহিরেও থাকে, কিন্তু সচরাচর ইহার অন্তর্গত এবং রণক্ষেত্রের যতদূর সম্ভব নিকটস্থ কোন নিভৃত সুরক্ষিত স্থান পাইলে যুযুৎসুগণ বাহিরে নেপথ্যভূমি রচনা করে না ; তবে অবস্থানুসারে যুদ্ধক্ষেত্রের দ্রুত পরিবর্ত্তনের সহিত নেপথ্য

ভূমিও পরিবর্ত্তিত বা নব নব নেপথ্য-কেন্দ্র রচিত হয়। প্রধান নেপথ্য কেন্দ্র হইতে যুদ্ধভূমির মধ্য দিয়া রণক্ষেত্রে যে পথে রসদ রণসম্ভার সৈন্য ও সংবাদাদি আসে সেই পথের উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে ছাউনি (garrison) করিয়া সৈন্য দ্বারা সে পথ সুরক্ষিত রাখিতে হয়, এবং সেই পথিমধ্যে যে যে নেপথ্য-কেন্দ্রে এই সকল সামগ্রী সঞ্চিত হয় তাহাও খাত পরিখা কামান এবং সৈন্য দ্বারা নিরাপদ করিয়া রাখিতে হয় ; এই সৈন্য রণোপকরণ ও সংবাদ প্রেরণের পথকে সংযোজক পথ (line of communication) বলে। আততায়ী বা আত্মরক্ষীর দেশ হইতেই উপকরণ সৈন্য সংবাদাদি নেপথ্য ভূমিতে আসে এবং তথা হইতে আবশ্যক মত রণক্ষেত্রে প্রেরিত হয় ; সুতরাং যুযুৎসুর সেই সুদূর দেশ হইতে নেপথ্যভূমি ও যুদ্ধভূমি হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র অবধি বিস্তৃত এই দীর্ঘ পথকেও "সংযোজক পথ" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

আজ কাল কামানের পাল্লা (effective range) নিতান্ত অল্প করিয়া ধরিলেও ২।৩ মাইল, সুতরাং উভয় যুযুৎসু দলকে (combatants) এই গতি-পথের বাহিরে বা প্রান্তসীমায় প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কামান সাজাইতে হয় ; তাহার পর কামানের অগ্নি ধারার আশ্রয়ে পর্ব্বত স্তুপ বন বা খাতে অতি সংগোপনে ২।১ মাইল ব্যবধানে সৈন্যদল স্থাপন করিতে হয়। অধিকন্তু আজকাল উভয় পক্ষের যুদ্ধমান সেনার সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৮১৩ সালে লিপজিক যুদ্ধে এবং ১৮৭০ সালে গ্রাভ-লৎ যুদ্ধে উভয় পক্ষে প্রায় চার লক্ষ সৈন্য নিযুক্ত ছিল ; গত বুয়ার সমরেও প্রায় চারি লক্ষ সৈন্য বুয়ার ভূমির ভাগ্য পরীক্ষার্থে রণক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিল; কিন্তু গত রুষ জাপান

সমরের শেষভাগে রুষ ও জাপানী সেনার মোট সংখ্যা প্রায় নয় লক্ষে দাঁড়াইয়াছিল। ক্ষেপকাস্ত্রের গতির দূরত্ব বৃদ্ধি ও যুদ্ধমান সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রধানতঃ এই দুই কারণে রণক্ষেত্র (battle field), যুদ্ধভূমি (Theatre of war), এবং সংযোজক পথের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে ২।১ মাইল মাত্র স্থান ব্যাপিয়া একটি যুদ্ধ ঘটিত; এখন উভয় সেনার সম্মুখভাগ ৪০ মাইল পর্য্যন্ত দীর্ঘ ও তিন চার মাইল প্রস্থ হইতে দেখা গিয়াছে। যুদ্ধভূমিও এক একটি দেশ বা দেশাংশ ব্যাপিয়া রচিত হয়। গত বুয়ার সমরে যুদ্ধভূমি সমস্ত নাটাল ও অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেট এবং গত রুষ-জাপান সমরের জন্য সমগ্র মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়াই যুদ্ধভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপে যুদ্ধভূমি ও রণক্ষেত্রের বিস্তৃতি হেতু সংযোজক পথও বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। রুষ জাপান সমরে রুষ পক্ষকে সুদূর সেণ্টপিটার্সবার্গ হইতে রসদ, নূতন সৈন্য রণসম্ভার প্রভৃতি বহিয়া আনিতে হইত; জাপান টোকিও হইতে ৮।১০ দিনের মধ্যে মুকডেনে নূতন সৈন্য বা যুদ্ধ সামগ্রী আনিয়া ফেলিতে পারিত, কিন্তু সেণ্টপিটার্সবার্গ হইতে মুকডেনে আসিতে প্রায় দুই মাস (৭ সপ্তাহ) লাগিত। রুষের পরাজয়ের ইহা একটি প্রধান কারণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আজ কাল যাহা কিছু সামরিক ব্যাপার তাহাই আয়তনে ও সংখ্যায় বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে।

অভিনব অস্ত্রশস্ত্র ও নূতন রণ তন্ত্রের আবিষ্কার হেতু পূর্ব্বের সৈন্য বাহিনীর অপেক্ষা আজ কালকার বাহিনীর অঙ্গগুলি বহুলাংশে পুষ্ট ও তাহাতে নানা নূতন অঙ্গের যোজনা হইয়াছে। দেড়লক্ষ সৈন্যের কমে আজ কাল একটি যুদ্ধোপযোগী অক্ষৌহিনী

(army) বা ফৌজ হয় না; এই প্রকাণ্ড অক্ষৌহিনী একজন সেনাপতির (General) নেতৃত্বে চালিত হয়; এই প্রকার তিন চারিটি অক্ষৌহিনী আবশ্যক হইলে তিন চার জন সেনাপতির উপর তাহাদিগের নেতৃস্বরূপ একজন প্রধান সেনাপতি (field-martial) নিযুক্ত হয়েন ; ইহার স্কন্ধেই এই পাঁচ ছয় লক্ষ সেনার গঠিত মহাচমূ চালনার দায়িত্ব নির্ভর করে। এক একটি অক্ষৌহিনীর (army) দেড় লক্ষ সৈন্য তিনটি অনীকিনীতে (division) ভাগ করা থাকে। প্রত্যেক অনীকিনীর চালনার ভার এক এক জন অনীকিনীপতির (divisional commander) হস্তে ন্যস্ত করা হয়। একটি অনীকিনীর পঞ্চাশ হাজার সৈন্য আবার ৩৫ বা ৪০টি ২।৩টি চমূতে (brigade) পল্টন (regiments) বা বাহিনী বিভক্ত থাকে ; প্রত্যেক পল্টন এক এক জন কাপ্তান বা সেনানীর (Captain) অধীনে থাকিয়া কার্য্য করে। প্রত্যেক বাহিনী আবার তাহার অন্তর্ভুক্ত সৈন্য-সংখ্যা অনুসারে ১২টি হইতে ১৫টি গণে (Company) শ্রেণীবদ্ধ থাকে। এক শত বা এক শত বিশটী সৈন্যে একটি গণ, ৫০।৬০জন শিপাহীতে একটি সেনামুখ (Half Company) এবং ১২।১৫জন সৈন্য একটি পংক্তি (Section) হয়। পল্টনের এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ চালনা করিবার জন্য নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ সেনানী (Lieutenant, and company and section officers) নিযুক্ত থাকে। সংক্ষেপতঃ সৈন্য বিভাগের ইহাই বর্ত্তমান পদ্ধতি। একটি অক্ষৌহিনীকে নানা যুদ্ধোপযোগী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দলে ভাগ করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয় গুলিতে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য :—

প্রথমতঃ, বিভাগ করিবার সময়ে নেতৃত্ব যেন একই সেনা-

পতি বা প্রধান সেনাপতির হস্তে অক্ষুন্ন থাকে। সৈন্য চালনা আক্রমণ প্রত্যাহরণ চর নিয়োগ প্রভৃতি কার্য্যে সেনানী ও সেনাপতিগণ অনেকাংশে স্বাধীন; কিন্তু যখন কোন লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যান্তরে সেনা চালনা করিয়া এক মহাযুদ্ধের উদ্দেশ্য (objective) সিদ্ধ করিতে হইবে তখন তাহাদিগকে প্রধান সেনাপতির আদেশানুসারে কার্য্য করিতে হয়; তাহা না হইলে পদাতিক অশ্বারোহী কামান প্রভৃতি বাহিনীর নানা অঙ্গগুলি যুদ্ধকালে এক লক্ষ্যে কেন্দ্রীকৃত ও নিয়োজিত করা যায় না। নেতৃত্ব এক হস্তে অক্ষুন্ন থাকিলেই সমগ্র শক্তিসমষ্টি একমুখী হয়।

দ্বিতীয়তঃ, বিভাগ করিবার সময়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন সে বিভাগ পদ্ধতি অতি সরল সহজবোধ্য ও কার্য্যকরী হয়; এক বিরাট সেনা আশীবিষের সহস্র ফণার ন্যায় কার্য্য করিবে, সে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সুশৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য না থাকিলে বিনা বাধায় নির্বিঘ্নে দ্রুতগতি কার্য্য চলে না। বিভাগ এরূপ সরল পদ্ধতি দ্বারা করিতে হইবে যে, সকল কার্য্যই যেন স্বতই স্বভাবের নিয়মে হইয়া যাইবে, আদেশ গ্রহণ পালনে কর্ত্তব্য বুঝিতে বুঝাইতে যেন কোন বিশেষ প্রয়াস করিতে না হয়।

তৃতীয়তঃ, বিভাগ কালীন যেন কোন বিশেষ সৈন্যদলের বাহু-যুদ্ধে অর্জ্জিত সম্মানে ও অতিপ্রিয় স্মৃতিগত বন্ধনে হস্তক্ষেপ না করা হয়। চিলিয়ন্‌ওলা মুদকির ন্যায় বহু রণে হয় তো প্রতাপ সিং কাপ্তানের পণ্টন বীরত্ব দেখাইয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছে, সে পণ্টন না ভাঙ্গিয়া অক্ষুন্ন রাখিলে ভবিষ্যতে সকল যুদ্ধেই তাহারা কষ্টার্জ্জিত যশ মলিন হইতে দিবে না, তাহা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য আরো অধিক বীরত্ব দেখাইবে।

চতুর্থতঃ, বিভাগ করিতে যাইয়া যেন অনর্থক ব্যয়বাহুল্য না ঘটে। বুয়ার সমরে মধ্য ভাগে যখন ইংরাজকে ক্ষিপ্রহস্তে রণস্থলে যথেষ্ট সৈন্য প্রেরণ করিতে হইতেছিল, তখন নানা পল্টন ও অনীকিনী (division) গুলি খণ্ড খণ্ড অবস্থায় ক্রমে ক্রমে যাইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় পঁহুছিতেছিল। অপেক্ষা করিয়া প্রত্যেক চার পাঁচটি পল্টনকে সম্পূর্ণ করতঃ এক একটি অনীকিনী রণক্ষেত্রে পাঠানই ব্যবস্থা; কিন্তু ইংরাজ সেনাপতিগণের অপেক্ষা করিবার অবসর ছিল না, সেই নানা বিছিন্ন অংশকে যে কোন প্রকারে যোজনা করতঃ তাহারা নূতন দল গঠন করিয়া লইতেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজের নির্য্যাতনের ইহা একটি কারণ। ২৫০০০ হাজার সৈন্যে একটি অনীকিনী (Division) গড়িলে তাহা প্রধান সেনাপতির তত্ত্বাবধানে ও সেনাপতির কর্ত্তৃত্বে সেনার এক মহাবল বাহুতে পরিণত হয়; কিন্তু Army corps-এর উপর প্রধান সেনাপতির বিশেষ কর্ত্তৃত্ব নাই, ইহার চালনার জন্য এক স্বতন্ত্র সেনানীদল থাকে। সুতরাং ২৫০০০ হাজার না হইয়া ৭০০০০ হাজার সৈন্য হইলে তবে একটি Army corps কার্য্যকরী হয়। Cassel এর রুষ-জাপান সমরের ঐতিহাসিক এবিষয়ে তীব্র উপহাস করিয়া লিখিয়াছেন, "We, who of late have dabbled in army corps notwithstanding the manner in which the only army corps we sent to South Africa was immediately broken up and practically speaking disorganised, ought not to be above taking a lesson from the practical success achieved by the Japanese with their divisions

in Korea. With the army-corps system an army of fifty thousand men means two weak army corps staffs, in addition to the army staff; but with the divisional system one army staff and four strong indipendent divisions produce the same result with infinitely less cost and fuss."

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:০:—
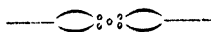
সেনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—পরিচয়।

রণক্ষেত্রের উপযোগী বিশাল সেনাপ্রবাহ নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ কার্য্যকরী অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টির দ্বারা গঠিত হয়। সেনার অঙ্গ সংখ্যায় প্রধানতঃ নয়টি, ১ম। পদাতিক, ২য়। অশ্বারোহী, ৩য়। কামান-বহর (artillery), ৪র্থ। অব্যর্থসন্ধানী দল (sharpshooters), ৫ম। চরসৈন্যদল (scouts & reconnoi tring parties), ৬ষ্ঠ। খনক সৈন্যদল (sappers and miners), ৭ম। যন্ত্রক (engineer corps), ৮ম। রসদ-বাহীদল (commiseriate) এবং ৯ম। চিকিৎসকদল (medical staff)।

সৈন্যদলের পূর্ব্বোক্ত নয়টি অঙ্গের মধ্যে যুদ্ধের জন্য পদাতিকই সর্ব্বপ্রধান উপকরণ; পদাতিকই যুদ্ধ করে, অশ্বারোহী এবং কামান-বহর প্রভৃতি পদাতিকের সহায়রূপে আক্রমণ, প্রত্যাহরণ, কুচ, কাওয়াজ, ব্যূহ-রচনা প্রভৃতি সামরিক কার্য্য সহজসাধ্য করিয়া দেয়। অব্যর্থসন্ধানী দল, যন্ত্রকদল, খনকসিপাহী দল এবং চিকিৎসক দল এই চারিটি সেনাঙ্গ বর্ত্তমান রণনীতির সৃষ্টি; পূর্ব্বে সৈন্য দলের সহিত এ গুলি থাকিত না, বা থাকিলেও আজ কালের ন্যায় তখন এ গুলির এত ঔৎকর্ষ্য সাধিত হয় নাই। কিন্তু পদাতিক, অশ্বারোহী, কামান ও গূঢ়চর দুই এক শত বৎসর পূর্ব্বেও ছিল। তবে বর্ত্তমান যুদ্ধ-

শাস্ত্রের অভিনব ঔৎকর্ষ্য ও অস্ত্রশস্ত্রের মারাত্মক শক্তির বৃদ্ধি হেতু এই পুরাতন অঙ্গগুলিও নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সেনার বিভিন্ন অঙ্গের স্বরূপ, গঠন-প্রণালী ও ব্যবহার বুঝিতে হইলে এই পরিবর্ত্তনের হেতুভূত অস্ত্রের নানা শক্তির সহিত পরিচিত হইতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য বর্ত্তমান রাইফেল গাদা বা টোটাদার রাইফেলের অপেক্ষা শত গুণ অধিক মারাত্মক হইয়াছে :—১। পাল্লা বা গতির দূরত্ব বৃদ্ধি, ২। অল্প সময়ের মধ্যে অধিক গুলি চালনা, ৩। কার্ত্তুজ লঘু হওয়ায় অধিক সংখ্যক কার্ত্তুজ বহনের সামর্থ্য, ৪। বারুদের ধূমহীনতা, ৫। গুলির ঋজুগতি, ৬। বন্দুকের ওজনের হ্রাস, ৭। লক্ষ্য করিবার যন্ত্রাদির সাহায্য লাভ। অস্ত্রের মারাত্মক শক্তির এইরূপ বিষম বৃদ্ধির ফলে পদাতিককে কথায় কথায় প্রাণ দিতে হয়। যুদ্ধকালে সামান্য মাত্র অসাবধান হইলে, সৈন্য কতকগুলি আবশ্যকীয় বীরসুলভ গুণের আধার না হইলে এবং শত্রু তাহার এই দুর্ব্বলতা বুঝিলে বর্ত্তমান অস্ত্রের মুখে বিরাট সেনাবল অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং এই সকল কাল অস্ত্রের হস্তে রক্ষা পাইয়া শত্রু দমন করিতে হইলে পদাতিকের নিম্নলিখিত গুণ গুলি থাকা আবশ্যক; —১ম। বাহুবল, ২য়। বুদ্ধিবল, ৩য়। লক্ষ্যশক্তি, ৪র্থ। কষ্ট-সহন-শীলতা, ৫ম। সাহস, ৬ষ্ঠ। কার্য্যপটুতা ও দ্রুতগতি, ৭ম। আত্মবিশ্বাস, এবং ৮ম। ধর্ম্মপ্রাণতা বা স্বদেশপ্রাণতা।

নূতন রণ-নীতি ও বর্ত্তমান যুগের সামরিক ইতিহাস যতই আলোচনা করা যায় ততই, দেখা যায়,যে, সে গুলি স্ফুটতর ভাবে একই সত্য প্রতিপাদিত করিতেছে; সে সত্য এই যে অস্ত্র যতই

মারাত্মক হউক না কেন, রণপদ্ধতি যতই নির্দ্দোষ ও উৎকৃষ্ট হউক না কেন, যুদ্ধ জয় পরাজয় তাহার উপর নির্ভর করে না; যে জাতি মহাশক্তি অস্ত্র-ধরিয়া রণাঙ্গনে সেই প্রকৃষ্ট রণ-পদ্ধতির লীলা দেখাইতেছে, সেই জাতির যোদ্ধদলের চরিত্রগত গুণের উপরই জয়শ্রী-লাভ নির্ভর করে। রাইফেল বা কামানকে কেহ ভয় করে না, ভয় করে যে ব্যক্তি কামান বা রাইফেলের পশ্চাতে রহে তাহাকেই। অস্ত্র বিজ্ঞানের বিষম উন্নতি দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে, আজ কালের এই মারাত্মক অস্ত্র থাকিলে যে কোন প্রকার সৈন্য হইলেই চলে, তাহার বিশেষ বীরোচিত গুণের আবশ্যক করে না। কিন্তু ইহা অতি ভ্রমাত্মক ধারণা। অস্ত্রের সম্যক ব্যবহার না জানিলে অস্ত্রশক্তি শত্রুক্ষয়ে নিয়োজিত হইতে পারে না। জাঁপানী রণ-পণ্ডিত মেজর জেনারাল নাগাওকা এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

"The contrivance of science has not minimised the value of the soldiers phisique. Soldiers are not chiefly food for powder; anything with two legs and two arms who can carry and let off a rifle is not good enough for battles."

"অস্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতি সত্ত্বেও সৈন্যের বীর্য্যবত্তার আবশ্যকতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সেনা কালান্তক অস্ত্রমুখে মরিবার ইন্ধন মাত্র, এ কথা রণ-নীতির প্রতিপাদিত সত্য নহে; রাইফেল যুদ্ধক্ষেত্রে বহিয়া লইয়া গিয়া ঋজুভাবে ধরিয়া কাওয়াজ করিতে পারে এরূপ যে কোন দ্বিপদ দ্বিভুজ পদার্থই সৈন্যের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে সক্ষম ইহা পাগলের উক্তি। রুষ এবং জাপা-

নীর একই অস্ত্র একই যুদ্ধনীতি এবং তুল্য রণপাণ্ডিত্য ছিল, তবে যে যুদ্ধে ত্রিশ হাজার জাপানী মরিত সে যুদ্ধে সত্তর হাজার রুষ মরিত কেন? যে ক্ষেত্রে একটি জাপানী রণতরী ভাঙ্গিল না, সে ক্ষেত্রে বল্‌টিক তরীবহর নিঃশেষে নির্মূল হইয়া গেল কেন? কারণ সাহসে বীর্য্যে ধর্ম্মে স্বদেশপ্রাণতায় সহ-শক্তিতে রণপটুতায় জাপানী রুষের অপেক্ষা বহুলাংশে গুণী। ইংরাজ বীর, সাহসী ও কর্ম্মপটু, আর আমরা অপেক্ষাকৃত ভীরু, দুর্ব্বল ও স্বার্থবশে কার্য্যে অপটু; কারণ ইংরাজের রণক্ষেত্র আছে তাই বীর্য্যের চর্চ্চা আছে, রাষ্ট্র আছে তাই রাষ্ট্রীয় জীবন এবং মানুষ হইবার পন্থা আছে; আর আমরা নিরস্ত্র রাষ্ট্রহীন, স্বার্থদাস, তাই পরদাস। বীর হইতে হইলে জয়শ্রীর বরপুত্র হইতে হইলে শুধু অস্ত্র লাভেই তাহা ঘটে না; আগে মানুষ হইতে হয়। আবার রণাঙ্গনে না দাঁড়াইলে মানুষ হয় না, ডাঙ্গায় সাঁতার শিখিয়া জলে নামা চলে না; জলে ডুবিয়া মরিতে মরিতে সাঁতার শেখে।

পদাতিককে মানুষ করিতে হইলে প্রথমে তাহার চরিত্র গড়িতে হয়। যে ধর্ম্মপ্রাণ ও স্বদেশপ্রাণ তাহার মরিতে ভয় নাই, কারণ সে জানে মৃত্যুর পরপারে এক অভিনব জীবন আছে, আর স্বদেশপ্রাণতার পুরস্কারে ঐহিক যশ ও পারত্রিক মঙ্গল। সুতরাং এ হেন যোদ্ধার সাহস ও সহিষ্ণুতা আপনি আসে। শারীরিক বল ও অভ্যাসের বশে এক প্রকার সাহস জন্মে বটে; কিন্তু সে সাহসের সীমা আছে, সেরূপ সাহসী কথায় কথায় জীবন দিয়া দেশের গৌরব বাড়াইতে জানে না। যোদ্ধা সাহসী ধর্ম্ম-প্রাণ ও স্বদেশপ্রেমিক হইলে বাকি ছয়টি গুণ অভ্যাস ও চর্চ্চার

ফলে অর্জ্জন করিতে হয়। সিপাহীকে বলিষ্ঠ করিতে হইলে তাহাকে ব্যায়ামশীল করিতে হয় এবং শ্রম, অনাহার, রৌদ্র ও বৃষ্টিভোগ, দূর গমন, পর্ব্বতারোহণ, ভার বহন প্রভৃতি সহাইয়া সহাইয়া ক্রমে সহিষ্ণু করিয়া লইতে হয়। নিয়মিত ব্যায়ামে শরীর কর্ম্মপটু ও বলিষ্ঠ হয় এবং সকল প্রকার কষ্ট ও অসুবিধা সহিতে শিখিলে যুদ্ধকালে সৈন্য কোন অসুখ অসুবিধাই দৃক্‌পাত করে না। বলিষ্ঠ ও সহিষ্ণু সৈন্য অনাহারে রৌদ্রে বা বৃষ্টি-দুর্য্যোগে বহুক্ষণ একভাবে যুদ্ধ করিতে পারে। মারাত্মক অস্ত্র-মুখ হইতে আত্মরক্ষা করিতে বুদ্ধিবল ও লক্ষ্যপটুতা না হইলে চলে না। আজ কাল সৈন্যকে হুকুমের পুত্তলি বা যন্ত্র হইয়া থাকিলে তাহার প্রাণ বাঁচান কঠিন হয়, কারণ নেতার আদেশ নিরপেক্ষ হইয়া তাহাকে অনেক সময়ে নিজে বুদ্ধি খাটাইয়া প্রহার ও আত্মরক্ষা করিতে হয়। কাপ্তেন হুকুম দিল আগুয়ান, তাই বলিয়া সৈন্যরেখা যদি সারি বাঁধিয়া কদমে কদমে গুলির মুখে আগুয়ান হয়, তাহা হইলে শত্রুর কাছে একজনও পঁহুছিবে না; হাজার রাইফেলের মুখ হইতে মিনিটে ৬০,০০০ হাজার গুলি ছুটিতেছে, সেই অগ্নিক্ষেত্র (zone *of* fire) সন্তরণ করিয়া আক্রমণ করিবার জন্য সারি বাঁধিয়া যুগপৎ অগ্রসর হইতে হইবে বটে, কিন্তু প্রত্যেক সিপাহীকে আবশ্যক মত উঠিয়া বসিয়া ঝুঁকিয়া, কখন স্তূপের আড়ে, কখন বন গুল্ম প্রস্তরের অন্তরালে এবং কখন বা বন্ধুর ভূমির গর্ত্তে খাতে আশ্রয় লইয়া প্রাণ বাঁচা-ইয়া চলিতে হইবে। শত্রুর কাছে বা যুদ্ধের অনুকূল স্থান হইতে স্থানান্তরে (from position to position) অধিকাংশ সিপাহী অক্ষত শরীরে পঁহুছিলেই হইল, যেরূপ কৌশলেই তাহা সুসিদ্ধ

হউক না কেন তাহাতে বড় আসিয়া যায় না। বুদ্ধিই আজ কাল মারাত্মক অস্ত্র হইতে সৈন্য রক্ষা করে। তাই বুদ্ধিমান জাপানী নির্বোধ রুষের অপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি ও দুর্ব্বল হইলেও অধিক কৌশলী ও যুদ্ধপটু। তাই ৬০ হাজার বুয়ার কৃষক তিন লক্ষ ইংরাজ সৈন্যকে তিন বৎসর জুতার তলে ইচ্ছামত দলিয়াছিল। তাই বুদ্ধিজীবী বলিয়া বাঙ্গালী ও পুণা ব্রাহ্মণকে ইংরাজ পণ্টনে নিয়োগ করে না।

কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বক কেবল শত্রুর সন্নিহিত হইলেই চলে না, অল্প সময়ে অব্যর্থ-হস্তে অনেক শত্রু মারিতে হইবে, নহিলে শত্রু-পক্ষের অস্ত্রাঘাতে অনর্থক ক্ষয়িতবল হইয়া প্রহার জর্জ্জরিত দেহে অধিকৃত অনুকূল স্থান (position) ছাড়িয়া পলাইতে হইবে মাত্র। এইজন্য লক্ষ্যপটুতার (sharp-shooting) এত আবশ্য-কতা! এই জন্যই আজ কাল একদল অব্যর্থসন্ধানী সৈন্যের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাদিগকে sharp-shooter বলে। ইহাদের একটিও গুলি ব্যর্থ যায় না, এবং ইহারা ফিকা নীল উর্দ্দি পরে বলিয়া দুর হইতে প্রায় অদৃশ্য হইয়া কার্য্য করে। সুকৌশলে গোপনে শত্রুর অলক্ষ্যে শত্রুরেখার সন্নিহিত হইয়া ইহারা ক্রত-হস্তে অল্প সময়ের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া সৈন্য, সেনানী, গোল-ন্দাজ ও কামানবাহী অশ্ব মারিয়া ফেলে। ১০০ জন অব্যর্থ-সন্ধানী অতি ক্রতহস্তে অচিরে একটি তোপ বাহিনী ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে ; নিম্নের অনুপাতে ইহাদিগের মারাত্মক ক্ষিপ্রতা সহজেই অনুমেয়,—এক শত জন অব্যর্থ সন্ধানী একটি কামান-বহরকে (battery.)

৪৪০	গজ	দূর	হইতে	২	মিনিটে	ধ্বংস	করে।
১১০০	”	”	”	৪	”	”	”
১৩২০	”	”	”	৭	”	”	”
১৬৫০	”	”	”	২২	”	”	”

পদাতিক দল দ্রুতগামী না হইলে শুভ অবসর বুঝিয়া শত্রুকে আক্রমণ বা সুকৌশলে পশ্চাদগমন করিতে পারে না। মহারাষ্ট্র ছত্রপতি শিবাজীর সেনা মিতাহারী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিল বলিয়া অতি দ্রুতগামী ছিল। তাহারা এরূপ বিদ্যুদ্গতিতে আসিয়া আচম্বিতে আক্রমণ করিত যে মোগল সেনা তাহাদিগকে ঐন্দ্রজালিক মায়াবী বলিয়া মনে করিত। ইউরোপজেতা ফরাসী-বীর নপোলিয়ঁ এই দ্রুতগতির জন্যই দুই বা বহুভাগে বিভক্ত শত্রু-সেনাকে তাহাদিগের পুণর্মিলিত হইবার পূর্ব্বে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া একে একে উৎসন্ন করিতে পারিতেন। বুয়ার-সমরের প্রথম ভাগে প্রতি ক্ষেত্রে বুয়ারের জয়শ্রী লাভের প্রধান হেতুই তাহাদিগের এই দ্রুতগামিতা গুণ। বুয়ার কূট-সমরী, সুতরাং তাহার প্রচ্ছন্ন ও বিদ্যুদ্বেগ গতির সহিত বিলাস-অলস ইংরাজ সেনা আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের স্বাধীন মুষ্টিমেয় বুয়ার সামরিক শাসনের (Discipline) অধীনে শিক্ষিত হয় নাই বলিয়া তাহারা যুদ্ধের সময়ে স্ত্রী পুত্র সঙ্গে লইয়া ফিরিত। বুয়ার বীরগণের পরিবার পরিজন অসংখ্য গাড়িতে করিয়া সেনার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিত। এই জন্য সমরের শেষভাগে বুয়ারদিগের দ্রুতগামিতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। মহাবীর ক্রঞ্জির অবরোধের ও আত্মসমর্পণের কারণ এই মৃদুগতি ও দীর্ঘ অশ্বযানশ্রেণী ব্যতীত আর কিছুই নহে। পদব্রজে পদা-

তিক সৈন্য বন্দুক গুলি বস্ত্র তৈজসাদি ও ৩।৪ দিনের আহার্য্য পৃষ্ঠে করিয়া ২৪ ঘণ্টায় ৩৫।৪০ মাইলের অধিক যাইতে পারে না। সেইজন্য আজ কাল অশ্বারূঢ় পদাতিকের (mounted infantry) সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা পদব্রজে চলিতে যেরূপ দক্ষ, অশ্বারোহণে এক দিনে ৭০।৮০ মাইল পথ অতিবাহনেও তেমনি পারগ। যুদ্ধকালে ইহারা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া কোন বনে বা খাতে অশ্বগুলি লুকাইয়া রাখিয়া পদব্রজে যুদ্ধ করে, আবার আবশ্যক হইলে মুহূর্ত্তে অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া অদৃশ্য হয়। বুয়ারগণ বহুকালের অভ্যাস ফলে অতি দক্ষ অশ্বারূঢ় পদাতিকে পরিণত হইয়াছিল।

পদাতিকের মধ্যে আরও তিনটি শ্রেণী বিভাগ আছে, যথা চরসৈন্য (scouts), যন্ত্রক (engineers) এবং খনক শিপাহী (sappers and miners)। চরসৈন্যের কর্ত্তব্য এই যে তাহারা অপরিচিত স্থানে "ফৌজের" চক্ষু স্বরূপ হইয়া কার্য্য করে। পথ ঘাট তাহারাই চিনিয়া লয়, শত্রুর গতিবিধি ও ঘাঁটি তাহারাই অন্বেষণ করিয়া বাহির করে, এবং এমন কি যুদ্ধের সময়েও চতুরতার সহিত অগ্রসর হইয়া শত্রু ব্যূহের কোন্ অঙ্গ দুর্ব্বল তাহার তথ্য লইয়া আসে। এই তথ্য সংগ্রহ (reconnoitre) কার্য্যে অবহেলা করিত বলিয়া ইংরাজ দক্ষিণ আফ্রিকায় পদে পদে লাঞ্ছিত হইত। কেবল মাত্র এই বিষয়ে অমনোযোগী হইয়াই ইংরাজ কলেঞ্জো ও মাগার্সফন্টেন যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিল। যাহারা গত মাঞ্চুরীয় যুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন অপূর্ব্ব তথ্যসংগ্রহ-পদ্ধতিই (reconnoitring) জাপানীর জয়লাভের অন্যতম কারণ। রাজনীতিজ্ঞ দূরদর্শী জাপানী রাষ্ট্র-

সচিবগণ বহু পূর্ব্বেই রুষের অতিরিক্ত রাজ্যলিপ্সা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে জাপানকে এই রুষ ভল্লুকের দন্ত ও নখর ছেদনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে; নহিলে এসিয়ার পরিত্রাণ নাই। তাই জাপানী গোয়েন্দাগণ দশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার প্রতি দুর্গ বন্দর ও নগর, প্রতি অরণ্য নদী গিরি এবং প্রতি পথ ঘাট বনমার্গের মানচিত্র ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করিতেছিল। সুতরাং যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন জাপানীর পক্ষে যুদ্ধভূমির (theatre of war) বিষয়ে আর কিছুই জানিবার নাই, তখন জাপানের রাজধানী টোকিওতে বসিয়া ধুরন্ধর সমর সচিবগণ অবলীলাক্রমে মহাযুদ্ধের ক্ষেত্র পদ্ধতি (plans of campaign) স্থির করিতেছেন এবং সেনাপতি ওকু, নজু, কিউরোকী ও টোগো রণক্ষেত্রে রহিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেছিলেন।

পদাতিকের জয়শ্রী লাভের অনুকূল আর একটি গুণ তাহার আত্মবিশ্বাস এবং সেনানী ও সেনাপতির নেতৃত্বে গভীর আস্থা। আমি শত্রু হইতে উন্নত বা তাহার সমকক্ষ, আমি ধর্ম্মযুদ্ধে মাতৃভূমির গৌরব রক্ষার্থ প্রবৃত্ত সুতরাং বিজয়লক্ষ্মীর বরপুত্র, আমি না করিতে পারি এমন কার্য্য নাই, এইরূপ দৃঢ় আত্মবিশ্বাস না থাকিলে সেনা প্রাণপণঃবিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। সেনাপতির চালনা শক্তি, দূরদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতায় পূর্ণ আস্থা থাকিলে তবেই তিনি সৈন্যদলকে যেখানে লইয়া যাইবেন, তাহারা হৃষ্টচিত্তে নিঃশঙ্কমনে তথায় যাইবে। যে সেনা উপর্য্যুপরি পরাজিত হইতেছে তাহার নেতৃত্বে নূতন অধিকতর অভিজ্ঞ সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া আসিলে অবসন্ন নিস্তেজ ম্রিয়মান সৈন্যদিগের দেহে

নূতন বলের সঞ্চার হয়, তাহার পর একটি মাত্র যুদ্ধ জয় করিতে পারিলেই তাহারা আবার জয়োন্মত্ত শত্রুর সমকক্ষ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ঘন ঘন পরাজয়ে মৃতকল্প ইংরাজ সৈন্য নব সেনাপতি লর্ড রবার্ট্‌সের আগমনে নূতন জীবনীশক্তি লাভ করিয়াছিল এবং বুয়ার বীর ক্রঞ্জির পরাজয়ের পর একেবারে দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছিল। অন্যদিকে বীর অথচ অপরিণামদর্শী ক্রঞ্জির নির্বুদ্ধিতাজনিত আত্মসমর্পনে এত দিবসের অজেয় কৃত-সঙ্কল্প বুয়ার সেনাগণ একেবারে ভগ্নোদ্যম ও হতাশ হইয়া পড়িল। মহাবীর De Wet তাঁহার "তিন বৎসরের যুদ্ধ" নামক পুস্তকের এক স্থানে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—Cronje did not know that he would destroy the warlike spirit of the burghers,and this catastrophe would be, to a great extent, the cause of an indescribable panic among all the burghers in the field, not only there, but also at Colesberg, Stormberg and Ladysmith. "On every countenance was dejection and despondency,and these exercised their influence until the end of the war."

আত্মবিশ্বাস এবং নেতায় আস্থা সৈন্যের জীবনীশক্তি; প্রতি যুদ্ধেই বিজয়ী জাপানী ইহার সাক্ষ্য। জাপানী দেশযজ্ঞে হেলায় আত্মদেহ বিসর্জ্জন করিতে শিখিয়াছে, তাই তাহাদের অচলা বিজয়-লক্ষ্মীতে অটল বিশ্বাস। ইউরোপ পররাষ্ট্রলোভী তাই পাপাচারী ও মৃত্যুভয়ভীত, সুতরাং এসিয়ার ধর্ম্মপ্রাণ ত্যাগশীল ঋষি-বীরকে কে জয় করিতে পারে?

জয়শ্রী লাভের অনুকূল সহায়ক এই যে আটটি গুণের কথা

বলিলাম জাপানী ইহার আধার। ইহার কতকগুলি জাপানীর জাতিগত সংস্কার এবং অন্যগুলি সামরিক বিদ্যালয়ে ইহারা বাল্য হইতেই শিক্ষা করে। এই অপূর্ব্ব শিক্ষা পদ্ধতির বিবরণের কতক অংশ উদ্ধৃত করিলেই পাঠক এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

"জাপানী সেনার শিক্ষার প্রথম স্তর ব্যায়ামাত্মক। মল্লক্ষেত্রে নানা অভিনব উপায়ে তাহাকে দৃঢ়পেশী ও সহিষ্ণু করা হয়। প্রথম সপ্তাহে শিক্ষার্থী কোন ভার স্কন্ধে না লইয়া অল্পদূর কুচ করিতে (Marching) অভ্যাস করে; যতই অভ্যাস-ফলে তাহার সহ্যশক্তি বাড়ে ততই তাহাকে দূর হইতে দূরতর পথ কুচ করিয়া অতিবাহিত করিতে হয়। ক্রমে মৃদুগতি ছাড়িয়া দ্রুত দ্বিগুণিত গতিতে কুচ করা (double march) আরম্ভ হয়। একপক্ষ কাল অভ্যাসের পর তাহাদের বহিবার বোঝার ভার বাড়িতে থাকে, এবং সমতল ক্ষেত্র ছাড়িয়া শিক্ষার্থী শিক্ষাক্ষেত্রে (drill ground) এতদর্থে নির্ম্মিত বন্ধুর ভূমে (Steeple-chase course) কুচ আরম্ভ করে। বিশেষ যত্নে তৈয়ারী এই বন্ধুর পথ ২৫০ গজ দীর্ঘ; ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত বাধা গুলি একটির পর একটি নির্ম্মিত আছে;—(১) ৯ফিট দীর্ঘ একটি খাত, কুচ করিতে করিতে ইহা সলম্ফে পার হইতে হয়; (২) ৪ফিট উচ্চ একটি প্রস্তর-ভিত্তি; (৩) ৩০ফিট দীর্ঘ অতি গভীর একটি খাত এবং তাহা পার হইবার জন্য তদুপরি রক্ষিত ৫। ৬টি বংশখণ্ড; (৪) ৪ফিট উচ্চ তীক্ষ্মমুখ কাষ্ঠ বা লৌহদণ্ডের বেড়া; (৫) একটি সৈন্য-সুরক্ষিত ব্যূহাংশ, তাহাতে প্রথমে একটি ১০ ফিট গভীর এবং ২০ ফিট পরিসর খাত, তাহার পর একটি প্রস্তরবন্ধুর দুর্গভিত্তি (parapet) এবং সকলের শেষে একটি

উচ্চ স্তূপ। দ্রুতপদে কুচ করিতে করিতে শিখার্থীগণকে এই সকল বাধা অতিক্রম করিতে হয়। এই সকল শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তবে প্রকৃত সামরিক শিক্ষার (Company and battalion training) আরম্ভ।

খনক সৈন্যের (Sappers and miners) এবং যন্ত্রকগণের (engineers) কর্ত্তব্যও অতি দুরূহ। যথায় বন জঙ্গল পর্ব্বত স্তূপ জলা ও ভূমির বন্ধুরতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক আশ্রয় নাই, তথায় খাত, পরিখা, স্তূপ, নালা, ভিত্তি, ব্যূহাদি কৃত্রিম বাধা ও আশ্রয়ের সৃষ্টি করতঃ যন্ত্রকগণ রাইফেলধারী পদাতিকের আত্মরক্ষা ও শত্রু আক্রমণ কার্য্যের সুবিধা করিয়া দেয়। এ যুগের অস্ত্রাদি যতই মারাত্মক হইয়া উঠিতেছে যুদ্ধার্থীগণ ততই মৃত্তিকা খনন করতঃ ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। রাইফেলের গুলিবৃষ্টি এবং শেল ও শ্রেপনেলের আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করা কোন আশ্রয়ের অন্তরাল হইতে যত সহজসাধ্য হয়, ভূতলে গর্ত্ত বা খাত খনন করিয়া তাহাতে লুকাইলে তদপেক্ষা অনেক সহজে হইতে পারে। শেল ও শ্রেপনেলের সহস্র সহস্র খণ্ড হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আলগা মাটি বা বালির বস্তা স্তূপাকারে রাখিয়া দীর্ঘ স্তূপ রচনা করিতে হয়; শেল ইহার মধ্যে পড়িয়া বা প্রবিষ্ট হইয়া ফাটিলে তত ক্ষতিকারক হয় না। শত্রুর রেল টেলিগ্রাফ নষ্ট করিতে, জলায় বা দুর্গম বনে সুগম পথ ত্বরায় নির্ম্মাণ করিতে, সহজে অল্প পরিশ্রমে নদী নালা বা জলার উপর সেতু বাঁধিতে, বা ব্যূহাদি রচিতে যন্ত্রক সৈন্যই প্রধান ভরসা। সেতু বন্ধনে পণ্টুনই আজ কাল ব্যবহৃত হয়। শত্রু ব্যবহার করিতে পারে এই ভয়ে যুদ্ধের সময়ে এক পক্ষ

দেশের সকল নদীস্থ সেতু ধ্বংশ করিয়া ফেলে। কিন্তু অপর পক্ষকে বৃহৎ সেনা লইয়া চলাচল করিতে হইলে তাহারা সেতু বিনা নদী সকল উত্তীর্ণ হইতে পারে না বলিয়া পণ্টুন বা ভাসমান সেতুর আবিষ্কার হইয়াছে। যখন বুয়ার সময়ে ইংরাজকে টিউগেলা নদী অতিক্রম করিতে হয়, তখন ইংরাজ সেনা বহু কষ্টে বহু অশ্ব ও কুলির সাহায্যে পণ্টুন সেতুর বিশাল গুরুভার অংশ গুলি শত শত ক্রোশ পথ বহিয়া লইয়াছিল। কিন্তু জাপানীরা যে পণ্টুন সেতু যুদ্ধে ব্যবহার করে তাহা অতি সহজে অশ্বপৃষ্ঠে যথেচ্ছা লইয়া যাওয়া যায়। ইহার এক একটি অংশ বা পণ্টুন ২৪ ফিট দীর্ঘ ও পাঁচ ফিট প্রস্থ, দৈর্ঘ্যে দুই খণ্ড করিয়া; ইহার সেই খণ্ডদ্বয়কে নৌকার ন্যায় (punt) ব্যবহার করা যায়। আবার দ্বিখণ্ডিত অংশদ্বয়ের প্রত্যেকটী তিন অংশে বিভক্ত বলিয়া দুই দুইটী খণ্ড অশ্ব বা খচ্চরের পৃষ্ঠে যথেচ্ছা বহিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই পণ্টুন তক্তা ও ক্যাম্বিস (Canvass) দ্বারা নির্ম্মিত সুতরাং অতিশয় লঘু। এই পণ্টুন দেখিতে ২৪ ফিট লম্বা এক একটি ডালাহীন বাক্সের ন্যায়; এমনি ৫০৷৬০টি পণ্টুন একত্র করিয়া তাহার উপর তক্তা ফেলিয়া ভাসমান সেতুর সৃষ্টি করে। এক একটি পণ্টুন এত লঘু যে ৬৮ মণ অবধি ওজন পৃষ্ঠে লইয়াও ইহা জলে ডুবিয়া যায় না। ইংরাজ নাকি এই বিংশ শতাব্দীতে সর্ব্বাপেক্ষা সুসভ্য জাতি; কিন্তু গত বুয়ার যুদ্ধে ইংরাজের বাহিনীর সহিত যে সকল জাপানী সেনানায়ক যুদ্ধ পরিদর্শনের জন্য (military attache) ছিল তাহারা সুসভ্য রণবিশারদ ইংরাজের নিকৃষ্ট উপকরণ ও প্রণালী দেখিয়া না জানি কতই কৌতুক বোধ করিয়া থাকিবে।
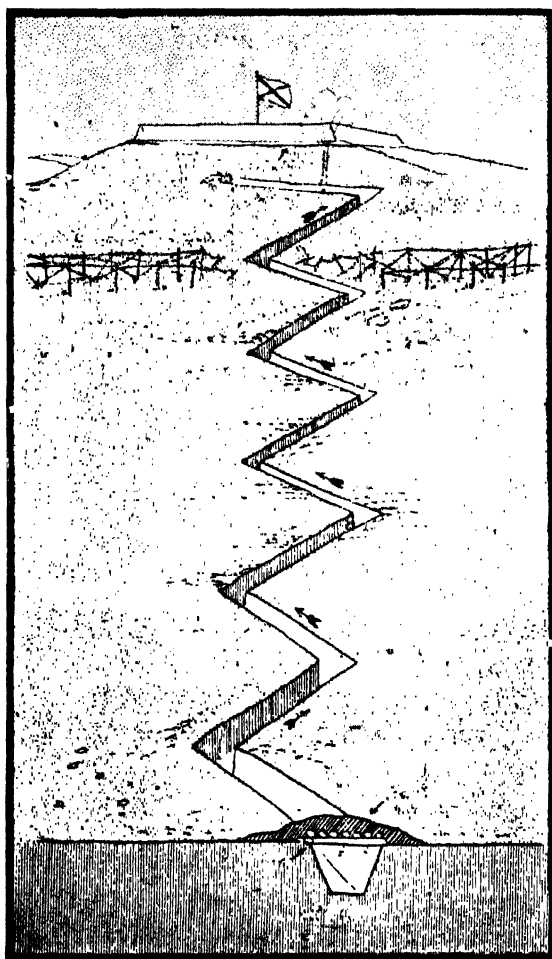
পর্ব্বতারোহণের খাত।

একটি অনীকিনী সহিত যে খনকদল থাকে, তাহাদের সহিত পণ্টুন প্রভৃতি নানা সেতু বাঁধিবার এত প্রচুর উপকরণ থাকে যে তদ্বারা ২০০ গজ দীর্ঘ সেতু নির্ম্মান করতঃ সেনার নদী পার করিবার উপায় করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের সহিত যে তার, তাড়িৎযন্ত্র প্রভৃতি থাকে তদ্বারা আবশ্যক হইলে ১৫০ মাইল টেলিগ্রাফ লাইনের সৃষ্টি হইতে পারে। জাপানী যন্ত্রকগণ যুদ্ধে আবশ্যকীয় যাহা কিছু সামগ্রী সে সকলই সঙ্গে লইয়া চলিত। কোন জনহীন সমুদ্রতটে শত্রুর অলক্ষ্যে সৈন্য আনিয়া নামাইবার আবশ্যক হইলে এই শিল্পীগণ দুই এক ঘণ্টার মধ্যে কাঠের লঘু ও কার্য্যোপযোগী সৈন্যনিবাস (barracks) ছাউনি রসদাগার প্রভৃতি তৈয়ারি করিয়া ফেলিত।

কিন্তু যখন শত্রুপক্ষের শত শত কামানের অগ্নিবর্ষণ শিরে ধরিয়া দুর্গ আক্রমণ করিতে হইতেছে,তখন ভূগর্ভে বক্র সর্পাকৃতি খাত খনিয়া তন্মধ্যে রহিয়া সৈন্যগণ দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হয়। এই সর্পাকৃতি আঁকা বাঁকা খাতকে সামরিক ভাষায় Sap বলে। শত্রু ব্যূহের কোন অংশ ভগ্ন করিয়া প্রবেশ পথ করিয়া লইতে হইলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ বা রন্ধ্র (mine) কাটিয়া তাহা দুর্গ বা ব্যূহতলে লইয়া গিয়া তাহাতে বারুদ ভরিয়া অগ্নি সংযোগে দুর্গ বা ব্যূহাংশ উড়াইয়া দিতে হয়। এইরূপ বক্র খাত ও সুড়ঙ্গ কাটিবার জন্যই খনক শিপাহীর আবশ্যকতা। রুষ জাপান সমরে পোর্টআর্থর অবরোধে এই খনক শিপাহীর সাহায্যেই জাপানীরা অগণ্য দুর্গ ও ব্যূহ ধ্বংস করতঃ হস্তগত করে; তাহারই ফলে পরিণামে পোর্টআর্থার বিজয় হইয়াছিল।

রসদবাহী এবং চিকিৎসক দল প্রকৃত সৈন্যশ্রেণী ভুক্ত নহে;

ইহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সর্ব্বদা একদল সৈন্য নিযুক্ত থাকে, এবং যুদ্ধের সময়ে ইহারা রণক্ষেত্র হইতে ঈষৎ বাহিরে দূরে থাকিয়া কার্য্য করে। রসদ ও রাইফেল এবং কামানের গুলি গোলা বহনের জন্য প্রতি পল্টনের সহিত অস্ত্রবাহী (ammunition corps & commiseriate corps) এবং খচ্চর (mules) ও কুলি থাকে। প্রত্যেক শিপাহীর জন্য প্রায় ৩০০০ কার্ত্তুজ্ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার কতক অংশ ও দুই চার দিনের খাদ্য সৈন্য স্বয়ং বহন করে, এবং অবশিষ্ট কতক যান গুলিতে বোঝাই দেওয়া হয় এবং খচ্চর দল ও কুলির পৃষ্ঠে বাহিত হয়।

রসদবাহী এবং চিকিৎসক দল প্রকৃত সৈন্য শ্রেণীভুক্ত নহে। ইহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সর্ব্বদা একদল সৈন্য নিযুক্ত থাকে এবং ইহারা যুদ্ধের সময়ে রণক্ষেত্রের পশ্চাতে থাকিয়া কার্য্য করে। রাইফেলের গুলি, কামানের গোলা, বিস্ফুরক বোমা, এবং আলোক-সঙ্কেতের যন্ত্রাদি বহন করিবার জন্য প্রতি পল্টনের সহিত অস্ত্রবাহী যান (ammunition carts), খচ্চর (mules) ও বাহক দল থাকে। প্রত্যেক যোদ্ধার জন্য নির্দ্দিষ্ট ৩০০০ কার্ত্তুজের কতক অংশ সৈন্য স্বয়ং বহন (১০০০ কার্ত্তুজ) করে, কতক খচ্চর ও বাহকের পৃষ্ঠে প্রত্যেক কোম্পানী দলের সহিত চলে এবং অবশিষ্টাংশ পল্টনের অস্ত্রবাহীযানে রক্ষিত থাকে। অস্ত্রবাহী দলের (ammunition columns) সংক্ষেপতঃ ইহাই বিভাগ রীতি।

রসদ বিভাগস্থ (commiseriate department) কর্ম্মচারীদিগের দুইটি শ্রেণী আছে, যথা রসদ প্রেরক (supply officers) এবং রসদবাহক (Transport officers)। প্রথম শ্রেণীর কর্ত্তব্য

সেনার জন্য আবশ্যকীয় ও উপযোগী রসদ সংগ্রহ করা, যথোপযুক্ত স্থানে রক্ষা করা এবং হিসাব করিয়া প্রয়োজনানুযায়ী পরিমাণ আহার্য্য,তৈজস,ও দ্রব্যাদি যুদ্ধস্থলে এবং প্রত্যেক অক্ষৌহিনী, অনীকিনী বা পল্টনের ছাউনীতে প্রেরণ করা; এবং রসদবাহীর কর্ত্তব্য যানে, অশ্বে, খচ্চরে এবং বাহকের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া তাহা যথাস্থানে ঠিক সময়ে পৌঁছাইয়া দেওয়া। রসদ বহনের জন্য নানা দেশে নানা প্রকার যান ও বাহনাদি ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে অশ্ব যান (horse-cart), নর-যান (hand-cart), ভারবাহী অশ্ব (pack-horse) এবং কুলিই প্রধান। গো-যান অতি মৃদুগামী, সুতরাং সচল সেনার সহিত তাহা চলিতে পারে না বলিয়াই ব্যবহৃত হয় না; অন্য সময়েও দ্রুতগামী অশ্ব বা অশ্বযান পাইলে গো-যান কখনই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। ভারবাহী ঘোটকের অভাব হইলে তদ্‌পরিবর্ত্তে আজকাল খচ্চরে রসদ বহন করে। যানগুলি যতদূর সম্ভব লঘু হওয়া কর্ত্তব্য, সমগ্র যানটির ওজন ৫৲ মণ হইলে আরও ৫৲ মণ বোঝা তাহাতে লইয়া দুইটি অশ্ব বা খচ্চর ১২ হইতে ১৮ মাইল পথ গিয়া আবার খালি গাড়ি লইয়া সেই পরিমাণ পথ একদিনে সচ্ছন্দে ফিরিয়া আসিতে পারে। নানা রসদ বিভাগের অভিজ্ঞতা ফলে দেখা গিয়াছে যে, অশ্ব বা খচ্চর প্রতিদিন ৪৲ সের বার্লী, ৪৲ সের তৃণ ও ৪৲ সের খড় খাইয়া ক্রমাগত ৩০ দিন পর্য্যন্ত উক্ত পরিমাণ কার্য্য করিতে পারে, ৩০ দিনের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর এক দিন বিরাম দিলেই বাহন আবার কর্য্যোপযোগী হয়।

নর-যান বা ঠেলা গাড়ির ওজন ২৷০৲ মন এবং সেই পরি-

মণ ভার লইয়া চার জন বাহক তাহা সচ্ছন্দে ১৫ মাইল লইয়া যায় এবং সেই দিনের মধ্যেই আবার সেই পথ খালি গাড়ি ঠেলিয়া ফিরিয়া আসে। ইংরাজের রসদ বহন এত সহজে এবং এত দ্রুত হয় না, কারণ বিলাসী ইংরাজ সেনার জন্য মদ্য, মাংস রুটি, চা, কফি, তামাকু ও বস্ত্র প্রভৃতি বহু সামগ্রী আবশ্যক হয়। জাপানী সেনা কিন্তু মিতাহারী ও বিলাসবিরাগী, সুতরাং তাহাদের জন্য চাউল এবং অশ্ব খচ্চরাদির জন্য বার্লী ও তৃণ বস্তায় ভরিয়া লইলেই হইল।

খাদ্যসম্ভার সঞ্চয়ের জন্য নিজ করায়ত্ত দেশের একটি উন্মুক্ত স্থানে ডিপো খুলিতে হয়। চতুর্দ্দিক হইতে নানা পথ আসিয়া এই ডিপোয় মিলিত হইয়াছে, এই সকল পথ বাহিয়া অশ্বে, যানে, লোক পৃষ্ঠে নানা দিগ্‌দেশ হইতে আহরিত শস্যাদি আসিতেছে এবং প্রত্যেক পথের পার্শ্বে ডিপো হইতে কিয়দ্দূরে মঞ্চের উপর উর্দ্দিধারী লেখক (Tally clerks) বসিয়া সেই সকল অন্তপ্রবেশী ও বহির্গামী মাল গাড়ির সংখ্যা লিখিয়া লইয়া তাহাদিগকে পরওয়ানা দিতেছে। রসদ বহন ও সঞ্চয়ের সংক্ষেপতঃ ইহাই রীতি।

ইংরাজের সেনা রসদ-সঞ্চায়ক ও রসদবাহী (Supply and Transport) একই বিভাগে একত্র কার্য্য করিত এবং প্রত্যেক পল্টনের বা বিশেষ সেনাদলের আপন আপন রসদবাহী শ্রেণী (Supply columns) থাকিত। বুয়ার সমরে এই পদ্ধতির ভ্রম বুঝিয়া সেনাপতি লর্ড রবার্টস্ ইহার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করেন। রসদপ্রেরক ও রসদবাহক দল পৃথকভাবে পৃথক বিভাগে স্ব স্ব কর্ত্তব্য করিলে তাহা যেরূপ সহজে সুশৃঙ্খলায়

সহিত সম্পন্ন হইতে পারে একত্র সেরূপ হয় না। যে বিভাগে দুই চার হাজার কর্ম্মচারী ও বাহক অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে হয়ত ৫০০০০ পঞ্চাশ সহস্র অশ্ব ও খচ্চর এবং লক্ষ দুইলক্ষ সৈন্যের আহার্য্য পরিধেয় তৈজসাদি সঞ্চয়, সংরক্ষণ ও দিকে দিকে প্রেরণ করিতেছে, সে বিভাগের কর্ম্মভার যত ভিন্ন ভিন্ন দলের হস্তে বিভক্ত করিয়া দেওয়া যায় ততই তাহার কার্য্য পদ্ধতি সরল ও কার্য্যকরী হইয়া আসে।

বুয়ার সমরের পূর্ব্বে ইংরাজ সেনার ইহা ব্যতীত আরও অনেক দোষ ছিল। প্রত্যেক অনীকিনী (division), পল্টন (Brigade and regiment) এবং বিশেষ বিশেষ সৈন্যদলের (army corps) সহিত তাহাদের নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট রসদবাহী (supply columns) নিযুক্ত থাকিত। রসদ শ্রেণীগুলিকে এইরূপে বিক্ষিপ্ত রাখিবার ব্যবস্থার অতি বিষময় ফলই ফলিয়াছিল; যে যে সৈন্যদল প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত কেবলমাত্র তাহাদিগেরই রসদ শ্রেণীগুলি ব্যবহারে আসিত, অন্য যে যে দল প্রহরা কার্য্যে বা প্রত্যাসার সৈন্যরূপে (reserve) রহিত, তাহাদিগের রসদ শ্রেণীর সহায়তা কার্য্যক্ষেত্রে পাওয়া যাইত না বলিয়া অনেক রসদ অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। এদিকে উপযুক্ত পরিমাণ রসদ না পাইয়া হয়ত যুদ্ধমান সেনা অনেক সময়ে বিপদাপন্ন হইত। লর্ড রবার্টস্ আসিয়া এই দোষ নিরাকরণ করেন; তাঁহার ব্যবস্থা অনুসারে সমস্ত রসদবাহী সঙ্ঘাত্মক শ্রেণী পৃথক দুই বিভাগে পরিণত হইয়া সেনাপতির কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিল এবং প্রয়োজনানুসারে নানা স্থানে আবশ্যকীয় পরিমাণে প্রেরিত হইতে লাগিল। এইরূপে এককালীন সমস্ত

সঞ্চিত রসদই যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহারে আসিয়া সৈন্যের অভাব বিমোচন করিল।

কেহ কেহ বলেন পূর্ব্ব রীতি অনুসারে প্রতি বিশেষ সৈন্যদলে বিশেষ রসদশ্রেণী নির্দ্দিষ্ট থাকিলে সেই সেই সেনাদল প্রাণপণ যত্নে ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করে, কারণ তাহারা বুঝে সেই শ্রেণীর অস্তিত্বের উপরই তাহাদের জীবন নির্ভর করিতেছে। কিন্তু সামরিক হিসাবে ইহা প্রকৃষ্ট যুক্তি নহে। সমস্ত রসদ বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা সেনাপতি বা প্রধান সেনাপতি করিবেন, তজ্জন্য বিশেষ সেনাদল সকল নিযুক্ত থাকিবে। সমগ্র যুদ্ধভূমে (theatre of war) শত্রু কোথায় কি ভাবে অবস্থিত আছে বা গতিবিধি করিতেছে তাহা প্রধান নেতাই অবগত থাকেন, সুতরাং সেনার রসদ রক্ষার দায়িত্বও তাঁহার ও তাঁহার সহকারীর (chief of the staff) হস্তেই থাকা কর্ত্তব্য।

সঞ্চয়বিভাগ ও বহনবিভাগের পৃথগীকরণ এবং সমগ্র রসদ নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে আনয়ন ব্যতীত লর্ড রবার্টস্ আরও দুইটি অত্যুৎকৃষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত করেন। তিনি রসদ বিভাগে ২৩৩জন রণদক্ষ সেনানী অথচ রসদতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিয়োগ করিয়া কর্ম্মচারী বিভাগকে (personnel of the staff) অতি দৃঢ় পদে অধিষ্ঠিত করেন; ইহারা অতি দক্ষতার সহিত ৪৬৭২ জন বাহকের সাহায্যে ইংরাজের রসদবিভাগ অনেকাংশে পূর্ণাঙ্গ করিয়া আনিয়াছিল। রবার্টসের আগমনের পূর্ব্বে রসদক্রয় ব্যাপার এতদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ সেনানীর হস্তে ছিল বলিয়া বিপুল অর্থ অযথা নষ্ট হইত; রবার্টস্ একজন অতি দক্ষ অর্থনীতিবিৎ নিয়োগ করায় তাঁহার সাহায্যে

রসদ বিভাগের লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয় হইতে রক্ষা পায় এবং যথেষ্ট ব্যয়লাঘব ঘটে।

রসদ সচরাচর দুই প্রকার শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে, যথা লঘু-শ্রেণী (light column) এবং বৃহৎ শ্রেণী (heavy column or company)। প্রথমোক্তে ৪৯টি যান থাকে, ইহার দৈর্ঘ্য ১৩০০ গজ; দ্বিতীয় প্রকার শ্রেণীতে ১০০ যান চলে, ইহার দৈর্ঘ্য তিন মাইল অবধি হয়। রসদ বিভাগস্থ (commiseriate depart-ment) কর্ম্মচারীদিগের দুইটি শ্রেণী আছে, রসদ প্রেরক (sup-ply officers) এবং রসদ বাহক (transport officers)। প্রথম শ্রেণীর কর্ত্তব্য একটি পল্টন বা বাহিনীর উপযোগী রসদ সংগ্রহ করা, যথোপযুক্ত স্থানে রক্ষা করা এবং হিসাব করিয়া প্রয়োজনানুযায়ী পরিমাণ যুদ্ধস্থলে (battle field) প্রেরণ করা; এবং রসদবাহীর কর্ত্তব্য যানে, অশ্বে, খচ্চরে এবং বাহকের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া তাহা ঠিক সময়ে পৌঁছাইয়া দেওয়া। রসদ বা গোলাগুলি প্রভৃতি এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার সময়ে এই রসদবাহীদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একদল সৈন্য নিযুক্ত থাকে।

রণনীতিতে চিকিৎসা বিভাগের ন্যায় এরূপ কল্যাণকর হিতসাধক আর কিছুই নাই। বর্ত্তমান রণবিশারদগণ কালান্তক অস্ত্রমুখ হইতে সৈন্য রক্ষা করতঃ মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য কত কৌশল কত অভিনব বৈজ্ঞানিক উপায়ের আবিষ্কার করিতেছেন। কিন্তু কেবল মাত্র এই সামরিক চিকিৎসা বিভাগের (Royal army medical corps) উন্নতি ও পূর্ণাঙ্গতা সম্পাদন করিলেই সে উদ্দেশ্য যে বহুলাংশে সিদ্ধ হয় তাহা অতি-

অল্প রণনীতিজ্ঞেই উপলব্ধি করেন। তবে যুযুৎসুদল এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উদাসীন হইলেও নানা দেশের দয়ার্দ্রচিত্ত ব্যক্তিগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আহতের সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ এই অভাব অনেকটা পূরণ করিয়া দেন। কোথায়ও যুদ্ধ বাধিলেই নানা দেশের ধনী ও ধর্ম্মপ্রাণ লোকে অজস্র অর্থদান করেন, এবং অর্থ বলে স্বেচ্ছাসেবকগণ (Red cross Society) নামক সেবাশ্রম গঠন করতঃ যুদ্ধস্থলে যাইয়া আহতের শুশ্রূষায় রত হয়েন। বহু রমণী ও পুরুষ শুশ্রূষক (nurse) হইয়া এই আশ্রমের গুরুভার দায়িত্বময় কর্ত্তব্য গ্রহণ করেন। সামরিক চিকিৎসা বিভাগের ন্যায় ইঁহাদের বিভাগেও চিকিৎসা শাস্ত্রের নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও বহুদর্শী চিকিৎসক থাকে।

সামরিক চিকিৎসক দলের শ্রেণী বিভাগ পদ্ধতি নিম্নলিখিত রূপে সম্পন্ন হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদিগের পশ্চাতে বহু সহস্র বাহক অপেক্ষা করে, ইহাদিগের কর্ত্তব্য অগ্নিমথিত ভয়াবহ যুদ্ধস্থান হইতে কৌশলে আহতদিগকে সরাইয়া অনতিদূরবর্ত্তী ক্ষতবন্ধনের আশ্রমে (dressing station) লইয়া যাওয়া। এই বাহকগণ অতিশয় সাহসী ও কর্ত্তব্যশীল, অনেক সময়ে প্রাণভয় তুচ্ছ করিয়া ইহারা এই কল্যাণকর কর্ত্তব্য সাধন করে। বুয়ার সমর ক্ষেত্রে ইংরাজ পক্ষের আহত-বাহক দলের প্রশংসা করিয়া জার্ম্মান রণবিভাগ লিখিতেছেন, "The royal army medical corps did splendid service at Magarsfontien. The officers, non-commissioned officers and bearers had traversed repeatedly with the greatest coolness the fire swept zone which was nearly a mile in depth."

আহত বাহকদল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আহতগণকে প্রথমে যে আশ্রমে (dressing stations) লইয়া যায়, তথায় তাহাদিগের রক্তক্ষয় নিবারণ জন্য ক্ষত স্থান বন্ধন করিয়া দেওয়া হয় এবং যতটুকু চিকিৎসা হইলে আপাততঃ জীবন রক্ষা হইবে ও ভীষণ যন্ত্রণার কতক উপশম হইবে তাহাই মাত্র করা হয়। এই ক্ষত বন্ধনের আশ্রম গুলি যুদ্ধমান সেনাদলের (firing lines) ঠিক পশ্চাতে এক পোয়া পথের মধ্যে কোন নিভৃত স্থানে রচিত হয়। তাহার পর এস্থানের চিকিৎসা শেষ হইলে তৎক্ষণাৎ অপর একদল বাহক (volunteer bearer corps) আহতগণকে সে আশ্রম হইতে অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী ক্ষেত্র-চিকিৎসাশ্রমে (field hospitals) লইয়া যায়। এ আশ্রম যুদ্ধস্থান (battle field) হইতে এক বা দুই মাইল দূরে অবস্থিত থাকে এবং বহু বিজ্ঞ চিকিৎসক ও পরিচারিকা (nurse) আহতগণকে গ্রহণ করিয়া যথাযোগ্য অস্ত্রপ্রয়োগ (operations), ঔষধ দান, ক্ষতবন্ধন এবং সেবায় কতক সুস্থ ও তাহাদিগের যন্ত্রণার লাঘব করিয়া দেয়। দুই এক দিনের সেবা ও চিকিৎসার পর বিশেষ আহতবাহী ট্রেণে (ambulance train) করিয়া এই সকল রোগী ও আহত সৈন্য বহুদূরবর্ত্তী স্থায়ী সেবাশ্রমে (Stationary hospital) এবং নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে চলিয়া যায়। তথায় কিছুকাল থাকিয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে সেবাশ্রম পোতে (hospital ships) আরোহণ করতঃ ইহারা স্বদেশস্থ নানা সরকারী সেবাশ্রমে বা স্বগৃহে গমন করে। এই আহতবাহী ট্রেণ এবং সেবাশ্রম তরী উভয়েতেই চিকিৎসক ও নানা চিকিৎসার যন্ত্রসম্ভারে সজ্জিত

থাকে ; সুতরাং আহত সৈন্যদিগের দীর্ঘ পথ ভ্রমণে কোন বিশেষ কষ্ট হয় না।

জাপানীদিগের চিকিৎসা বিভাগেরও ঠিক এমনি শ্রেণী-বিভাগ ও ব্যবস্থা। পার্থক্যের মধ্যে জাপানী চিকিৎসকগণ রমণীসুলভ কোমল ব্যবহারে ও লঘু হস্তে রোগীর সেবা করিতে পারে। জাপানী জাতি এসিয়াবাসী বলিয়া স্বভাবতঃ দয়ালু ও ধর্ম্মপ্রাণ ; সুতরাং তাহাদিগের অনির্ব্বচনীয় যত্নে ও প্রাণপণ সেবায় যে শত্রুগণও মুগ্ধ হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? বহু রুষ সৈন্য ইহাদিগের হস্তে জীবন পাইয়া আজও অশ্রুসিক্ত চক্ষে জাপানীর মহত্ত্ব ও মহাপ্রাণতা কীর্ত্তন করে।

সেনার এক অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ অশ্বারোহী। পূর্ব্বে অশ্বারোহীগণ দলবদ্ধ হইয়া পদাতিকের ন্যায় যুদ্ধে যোগদান করিত ; এখন মারাত্মক দূরগামী রাইফেলের গুলির মুখে অশ্বারোহী সম্মুখীন হইতে পারে না, কারণ অশ্ব ও অশ্বারোহীকে বহুদূর হইতেও সহজেই লক্ষ্য করিয়া আহত করা যায়। সুতরাং অশ্বারোহীর চরবৃত্তিই এখন প্রধান কর্ত্তব্য। যে আটটি গুণে পদাতিককে যুদ্ধোপযোগী করে, অশ্বারোহীও সেই সকল গুণে অলঙ্কৃত না হইলে সুচারুরূপে আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে না। তন্মধ্যে লক্ষ্যশক্তি ও দ্রুতগতি নিতান্ত আবশ্যক। চরবৃত্তি করিতে হইলে বিদ্যুদ্গতিতে পথ অতিবাহিত করিয়া শত্রুর অবস্থিতি ভূমি ও অভিসন্ধি জানিয়া আবার অবিলম্বে নিজ ছাউনীতে পঁহুছিয়া সংবাদ দিতে হয় ; কখনও বা শত্রুর দ্বারা অনুসৃত হইলে নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য নিরাপদে অন্তর্হিত হইতে হয়। সুতরাং অশ্বারোহীকে দ্রুতগামিতা লাভ করিতে হইলে

অশ্বচালনা বিদ্যা সম্যক আয়ত্ব করিতে হয় এবং নিজ নিজ অশ্বের যত্ন ও পরিচর্য্যা করার অভ্যাসে অভ্যস্থ হইতে হয়। যে অশ্বারোহী পল্টনে (Squadron) অশ্বের সেবা ও যত্ন নাই, সে পল্টন সহস্র যোদ্ধসুলভ গুণে গুণবান হইলেও শত্রুর হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করে। যখন ইংরাজেরা বুয়ার বীর ক্রঞ্জির পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল, তখন তাহারা অশ্বের পরিচর্য্যায় অবহেলা করিয়া স্বপক্ষের অশ্বারোহী সৈন্যকে প্রায় অকর্ম্মণ্য করিয়াছিল। সে সময়ে দশ দিনের মধ্যে প্রায় ১৬০০ অশ্ব যত্নের অভাবে নষ্ট হয়; একটি পল্টনে (regiment) কেবল ২৮টি মাত্র কার্য্যোপযোগী ছিল। সময়ে খাদ্য (forage) এবং জলের অভাবে, ব্যবহারের দোষে, গ্রীষ্মাতিশয্যে, কুচ করিবার কালীন সুনিয়মের (discipline) অভাবে এবং সমুদ্র পথে ও রেলযোগে ইংলণ্ড হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার দীর্ঘ পথের কষ্টে ইংরাজের বহু অশ্ব রুগ্ন, মৃত, অপহৃত এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিল। জার্ম্মান পক্ষের যুদ্ধদর্শক (Military attache) সেনাপতি এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া নিম্নলিখিত তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:—The omission on the part of the officers and non-commissioned officers of the cavalry to interfere energetically in order to maintain proper discipline in marching and riding was most destructive. The reason for the large number of galled horses became at once apparent, on seeing the men lolling on their saddles in the most careless manner." "অশ্বারোহী সৈন্যগণ অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ এবং কুচ করিবার সময়ে যেরূপ অসাবধানতার সহিত

দুলিতে দুলিতে চলিত, তাহাতে যে অসংখ্য অশ্ব ক্ষতাক্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইবে তাহা আর বিচিত্র কি?" মাঞ্চুরীয় সমরে জাপানী অশ্বের মৃত্যু তালিকা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সমরে ইংরাজ পক্ষে অশ্বের মৃত্যুর তালিকা তুলনা করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। জাপানীদিগের এরূপ সুন্দর ব্যবস্থা যে ১৪ মাসের যুদ্ধে তাহাদিগকে প্রতি একশত অশ্বারোহীর জন্য মাত্র ৫০টি নূতন অশ্ব যোগাইতে হইয়াছে; কিন্তু বুয়ার সমরে ইংরাজগণ স্বপক্ষের প্রতি শত অশ্বারোহীর জন্য ২৫০ হইতে ৪০০ শত ঘোটক যোগাইয়াও তাহাদিগকে সকল সময়ে কার্য্যোপযোগী ও অশ্বারূঢ় রাখিতে পারে নাই।

জগতের মধ্যে দ্রুতগমনে শিখ, আরব, কসাক ও বুয়ার অশ্বারোহীর নিতান্ত আবশ্যক। শত্রুর সম্মুখীন হইলে বা অল্প সংখ্যক শত্রুর দ্বারা অনুসৃত হইলে অশ্বারোহীকে ভূমে অবতরণ করিয়া আত্মগোপন করতঃ রাইফেল চালনা করিতে হয়। কি যুদ্ধকালে, কি চর সৈন্যের কর্ত্তব্য সম্পাদনে এবং কি পলায়নে লক্ষ্যপটুতাই অশ্বারোহীর জীবন রক্ষা করে। অশ্বারোহণে যুদ্ধ করিলে আহত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে বলিয়া লক্ষ্যপটু অশ্বারোহীকে ভূমে নামিয়া পদাতিকের ন্যায় যুদ্ধ অভ্যাস করিতে হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ক্ষেত্রনীতি—অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার।

বর্ত্তমান রণাস্ত্রের মধ্যে কি মসার রাইফেল এবং কি যান্ত্রিক বা ১২ ইঞ্চি নৌ-কামান উভয়ই যেরূপ ভয়াবহ শক্তির আধার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এই সংহারক অস্ত্র শক্তির ফলে যে সমরক্রীয়া কৌশল (tactics) ও ক্ষেত্রনীতি (strategy) সম্পূর্ণ অভিনব আকার ধারণ করিবে তাহাতে বিচিত্রতা কি ? যুদ্ধকালে সৈন্ত ও সেনানীর প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য যদি নানা কৌশলে ও ক্ষেত্রনীতির (strategy) আবিষ্কার না হইত তাহা হইলে ব্লক সাহেব যাহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহাই ঘটিত,—অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে উভয় যুযুৎসু সেনা কেবল মাত্র দূর-পতি ক্ষেপকাস্ত্রের মুখেই নির্ম্মূল হইয়া যাইত। নানা অস্ত্র শস্ত্রের উদ্ভাবনের প্রতিক্রিয়া ফলে নানা কৌশল ও কূট ক্ষেত্রনীতি (strategy) গঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি মৃত্যুসংখ্যা যে কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে তাহা রুষ জাপান সমর আলোচনা করিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। বুয়ার সমরে মৃত্যুসংখ্যা পূর্ব্বাপর সমরাদির সংখ্যা হইতে অধিক হয় নাই বলিয়া অনেকে ব্লক (Bloch) সাহেবের কথার আংশিক সত্যও স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু বুয়ার সময়ে মৃত্যুসংখ্যা বর্দ্ধিত না হইবার দুইটি উল্লেখযোগ্য কারণ আছে। প্রথমতঃ, যুদ্ধের প্রারম্ভে

বীরোচিত গুণের এবং অভিনব সমরক্রীয়া কৌশল ও ক্ষেত্রনীতির ফলে বুয়ারগণ ইংরাজ সৈন্য হইতে এত শ্রেষ্ঠ ছিল, যে, যে ক্ষেত্রে ইংরাজ পক্ষে দুই সহস্র সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল সে ক্ষেত্রে বুয়ার পক্ষে হয়ত মাত্র ৫০।৬০ জন মরিয়াছিল। উভয় পক্ষে প্রায় তুল্য মৃত্যু-সংখ্যা না ঘটিলে মোটের উপর তাহা বাড়িবে কেন? দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের শেষ ভাগে যখন ইংরাজ পক্ষের সৈন্য-বল ও অভিজ্ঞতা বহুগুণে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, তখন নিরুপায় বুয়ার-গণ ব্যবস্থিত যুদ্ধ ছাড়িয়া অব্যবস্থিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং তখনও বুয়ার পক্ষে মৃত্যু-তালিকা বৰ্দ্ধিত হইবার অবসর পায় নাই। রুষ জাপান সমরে কিন্তু ইহা অতি ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল। এই সমরে মুকডেনের যুদ্ধই বলিতে গেলে ইহার শেষ অঙ্ক। মুকডেন-যুদ্ধের পূর্ব্ব অবধি কেবলমাত্র রুষ পক্ষে মৃত্যু সংখ্যা এক লক্ষ বাষট্টি হাজার এক শতে দাঁড়াইয়াছিল; কেবল মুকডেন যুদ্ধেরই মৃত্যু তালিকা কিন্তু এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার; অর্থাৎ এক বৎসরের অসংখ্য যুদ্ধে যত সৈন্য মৃত ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল এই একটি মাত্র যুদ্ধে তাহা অপেক্ষা ১২০০০ জন অধিক সৈন্য হত ও আহত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত এই ১৪ মাস ব্যাপী সমরের প্রতি মাসে প্রায় ৭০০০ হাজার সৈন্য রোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িত। সুতরাং রুষ পক্ষে সর্ব্বসমেত চার লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্য হত আহত ও রুগ্ন হইয়াছিল। জাপানী পক্ষে মৃত্যু তালিকা ইহার কিঞ্চিন্মাত্র কম।

যে সকল কৌশল ও ক্ষেত্র-নীতির ফলে সৈন্য নিশ্চিত মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পায় এবং অনায়াসে শত্রু উৎসন্ন করিতে পারে তাহা অতি সুন্দররূপে আয়ত্ব না করিলে কেহ বর্ত্তমান

যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করিবার উপযুক্ত হয় না; অব্যবস্থিত যুদ্ধের সমরীগণ এই তত্ত্ব যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ফলে সহজে আয়ত্ব করিতে পারে; বুয়ার তাহার দৃষ্টান্ত। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট রাইফেল এমন কি গাদা বা টোটাদার বন্দুক লইয়া পার্ব্বত্য আফ্রিদি গুর্খারা যেরূপে আত্মরক্ষা ও শত্রুর বল ক্ষয় করে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই অপূর্ব্ব ব্যাপার নিখুঁত আয়োজন নীতি (strategy) ও ক্ষেত্রনীতি (stactics) সাপেক্ষ্য। এ পরিচ্ছেদে আয়োজন-নীতিই আলোচ্য বিষয়। আয়োজন-নীতিতে এত বিভিন্ন প্রকার কৌশল আছে যে, তাহার সংখ্যা নির্দ্দেষ করা অসম্ভব। আমরা ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া এ পরিচ্ছেদে প্রথমার্দ্ধের কতকগুলি প্রধান কৌশলেরই উল্লেখ করিব। নিম্নলিখিত পাঁচটি উপায়ই বর্ত্তমান যুদ্ধে সৈন্যরক্ষার প্রধান সহায়:—

(১) অনুকূল ক্ষেত্র নির্ব্বাচন, (২) আশ্রয়ের ব্যবহার জ্ঞান —ক্ষেত্ররচনা, (৩) মন্ত্রগুপ্তি ও আত্মগোপন, (৪) তথ্য-সংগ্রহ, এবং (৫) নির্ব্বিঘ্ন ও অনতিদীর্ঘ সংযোজক পথ। এই পঞ্চ নীতির সমষ্টিতেই ক্ষেত্র নীতির প্রথমার্দ্ধের পরাকাষ্ঠা।

সেনাপতি ও সেনানীগণ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়া আত্মরক্ষা ও আক্রমণ উভয় কার্য্যের উপযোগী স্থান বাছিয়া লইয়া যথাযোগ্য সন্নিবেশ কেন্দ্রে (positions) সেনা রক্ষা করিবেন। শত্রুর ছাউনী ও নিজ রণক্ষেত্রের মধ্যে এক তুঙ্গ গিরিমালাকে অন্তরাল করিয়া শিখরে, অধিত্যকায়, গর্ত্তে, খাতে, শিলান্তরালে ও ক্ষুদ্র বৃহৎ তরুগুল্মাশ্রয়ে পদাতিক, অশ্বারোহী, কামান, চরসৈন্য, রসদ এবং অস্ত্রাগার সুকৌশলে রক্ষা করতঃ

সেনাপতি ও সেনানীগণ যুদ্ধ দান করিবেন। অনুকূল যুদ্ধক্ষেত্র পাইলে অতি অল্প সংখ্যক রণপটু সৈন্য বিশাল বাহিনীকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে। "The theatre of war enabled Boers to offer a lengthy and successful resistance owing to the the peculier cofigaration of the country." যুদ্ধভূমির বন্ধুরতা এবং অনুকূলতা বশতঃ বুয়ারগণ এত দীর্ঘকাল ইংরাজ বাহিনীর গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। To seize the broad and strongly defended section of the Orange River, desolate and hilly, with the maze of kopjes were difficult. The rolling plane about the Moder River between Kimberly and Bloomfontein full of cone-shaped smaller flat topped minences were admirably adapted for signal stations, and the folbs of the ground shored with the kopjes the advantages due *to* a clear field of fire in that largo region. More over, the Moder River afforded a large supply of water." লর্ড রবার্টস্ যখন নূতন সেনাপতি হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিলেন, তখন তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল কিম্বার্লী, ম্যাফেকিং ও লেডিস্মিথের অবরোধ উত্থাপন (to raise the seige)। তদুদ্দেশ্যে যাত্রা করিতে হইলে প্রধানতঃ দুইটি পথে যাওয়া সম্ভব ছিল; অরেঞ্জ নদীর প্রদেশ অতি বিস্তীর্ণ পর্ব্বত সঙ্কুল, বন্ধুর এবং সুরক্ষিত, এ পথে যাইলে ইংরাজ সৈন্য বুয়ার হস্তে বিব্রত হইত। অপর পক্ষে কিম্বার্লী ও ব্লুমফন্টেনের পথে সকল স্থানই প্রান্তর বহুল উর্ম্মিল এবং সমতলশির ক্ষুদ্র শৃচাগ্রপর্ব্বতে পূর্ণ; উন্মুক্ত

বলিয়া এই স্থান রাইফেল ও কামানের অগ্নিক্রীড়ার উপযোগী এবং সমতলশির গিরিগুলি সঙ্কেত কেন্দ্র (signal stations) করিবার অনুকূল। যদিও এ পথে রসদ বহনের জন্য কোন রেলপথের সহায়তা নাই, তথাপি মডার নদী থাকায় সৈন্যগণের জলাভাব ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না।

কামান ও রাইফেল অগ্নিক্রীড়ার উপযোগী, শত্রুর সৈন্য সন্নিবেশ দর্শনের উপযোগী, আশ্রয় বহুল এবং জলবহুল স্থান হইলেই তাহা সুন্দর রণক্ষেত্রে পরিণত করা যাইতে পারে। ইহার যে যে স্থানে যুদ্ধোপযোগী কেন্দ্র ও আশ্রয় নাই, সেই সেই স্থানে তাহা কৃত্রিম উপায়ে খনক সৈন্য ও পূর্ত্তশিল্পীর সাহায্যে পূরণ করিয়া লইতে হয়। কৃত্রিম আশ্রয়ের মধ্যে রহিয়া গুলি বর্ষণ করিবার জন্য অনুচ্চ ভিত্তি (parapet), কামান ও সৈন্য রক্ষা করিবার জন্য খাত (pits & saps) এবং স্তূপবেষ্টিত ব্যূহই (entrenchments) প্রধান। তুঙ্গ পর্ব্বত শিখরের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইলে সে সমতল পাষাণে লুকাইবার আশ্রয় হয়তো থাকে না, তখন সে স্থানে স্থূল অনুচ্চ অতি দীর্ঘ ভিত্তি রচনা করিতে হয়; ইহার পশ্চাতে থাকিয়া দেহের এক অষ্টমাংশ অর্থাৎ চক্ষু ও শিরাগ্র বাহির করিয়া শত্রু লক্ষ্যে রাই-ফেল চালনা করিতে হয়। এই শিলাখণ্ড বা মৃত্তিকা গঠিত স্থূল ভিত্তিগাত্রে লাগিয়া রাইফেলের গুলি অধিকাংশ তাহাতেই বিদ্ধ হইয়া থাকে এবং ইহার সম্মুখে পড়িয়া শেল বা শ্রেপনেল ফাটিলেও অপর পার্শ্বস্থ সৈন্যকে শীঘ্র আঘাত করিতে পারে না। অবশ্য মুহুর্মুহু আঘাতে যখন ভিত্তি ভগ্ন হয় তখন পুনর্ব্বার রাত্রি যোগে তৈয়ারি না করিলে তথায় সৈন্য রক্ষা সম্ভব হয় না।

পর্ব্বতের উপরে ভিত্তি গঠিত করিলে শত্রু তাহা লক্ষ্যে দূরক্ষেপী Howitzor কামান যোগে শেল নিক্ষেপ করিতে থাকে, সুতরাং তাহা অচিরে ভগ্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য পর্ব্বতের সানুভাগে ও গিরি-অঙ্কে নানা সমতল অংশে স্তূপ বেষ্টিত ব্যূহ (Shelter trenches) নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। আলগা মাটি বা রাশি রাশি প্রস্তর ও উপল খণ্ড অথবা বালির বস্তা সাজাইয়া এই স্তূপ বেষ্টন তৈয়ারি হয়। ইহার মধ্যে সৈন্য থাকিয়া শত্রু বধ করে। কামান যাহাতে শত্রু না দেখিতে পায় তজ্জন্য তাহা নাতি নিম্ন খাতে রক্ষিত থাকে। দুইটি সচল লৌহ দণ্ডের উপর কামান এরূপ সুকৌশলে সংলগ্ন আছে যে, এই দণ্ডদ্বয় পশ্চাদ্দিকে বক্র করিলেই তদূর্দ্ধস্থ কামান নামিয়া পড়ে এবং স্তূপ গর্ত্তের অন্তরালে লুকাইয়া যায়; আবার গোলা দাগিতে হইলে সেই দণ্ড দ্বয় সোজা করিলে কামান উচ্চে উঠিয়া লক্ষ্য করিবার উপযোগী হয়। ইহাকে disappearing system বা কামান গোপন পদ্ধতি কহে।

অনুকূল ক্ষেত্র নির্ব্বাচন জ্ঞান বা কৃত্রিম এবং অকৃত্রিম আশ্রয়ের ব্যবহার জ্ঞান যেরূপ জয়শ্রী লাভের উপায়, মন্ত্র গুপ্তি এবং আত্মগোপনও সেইরূপ সিদ্ধির সহায়। কিরূপে সৈন্য সজ্জা করা হইয়াছে, কোন্ কোন্ স্থানে কামান রসদ বা অস্ত্রাগার আছে এবং কতসৈন্য বিপক্ষতাচরণ করিতেছে, এ কথা শত্রু বুঝিতে পারিলে সে তদনুযায়ী উপায় গ্রহণ করে; তখন জয়লাভ অতি দুর্ঘট হইয়া পড়ে। এই আত্মগোপন ও মন্ত্রগুপ্তির ফলে বুয়ারগণ কলেঞ্জো এবং ম্যাগার্সফন্টেন ক্ষেত্রে ইংরাজের দর্প চূর্ণ করিয়া ছিল। এরূপ গুপ্তভাবে সৈন্য নানা স্থানে রক্ষা করিতে হইবে যে, শত্রু সহস্র চেষ্টায়ও তাহার অবস্থিতি স্থান

অশ্বের অন্তরালে আত্মগোপন।
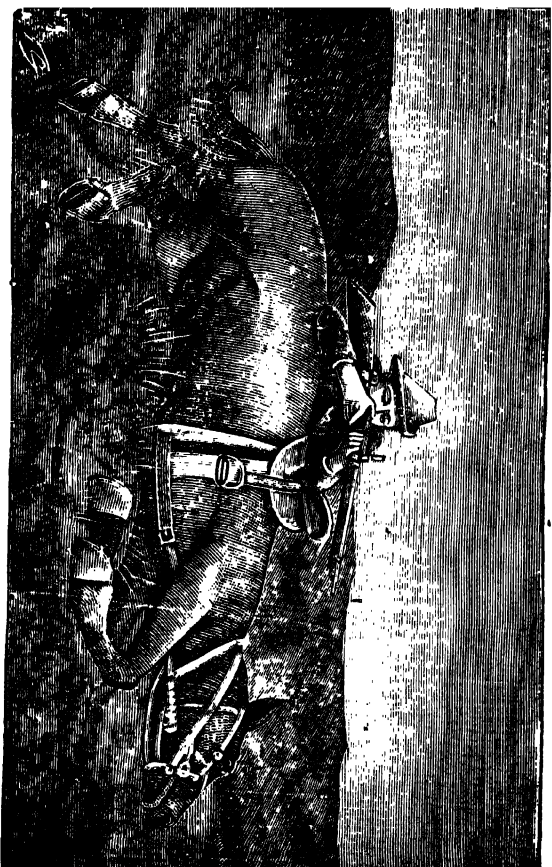
নিরূপণ করিতে না পারে; স্তুপ বেষ্টন বা খাত পরিখা গুলি এরূপ কৌশলে লতাগুল্ম দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে যে, শত্রু তাহার অতি সন্নিকটে আসিলেও তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে উপলব্ধি করিতে না পারে। কামান বহর এরূপ নিভৃত অংশে সাজাইতে হয় যে, তাহা যতক্ষণ ইচ্ছা লুক্কাইত রাখা চলে, এবং শুভ অবসর বুঝিয়া সহসা বজ্র নির্ঘোষে শত্রু নিপাত করিতে পারে। বুয়ার যুদ্ধের সময়ে ইংরাজ পক্ষের লেফটেনাণ্ট জেনারল কেলিকেনি Lieutenant General Kelly Kenny) ইংরাজ সৈন্যের জন্য যে নূতন পদ্ধতি লিখিয়া সৈন্যগণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহার একস্থানে আত্মগোপন বিষয়ে তিনি বলিতেছেন, "Too much importance cannot be laid on the necessity of concealing the positions and movements of troops from the enemy; a few officers or men exposing themselves to view, may upset the most carefully laid scheme." "সৈন্যের গতিবিধি এবং সন্নিবেশ কেন্দ্র গুলি গোপন রাখাই সিদ্ধির প্রধান উপায়। জন কয়েক সেননী বা সৈন্য শত্রুর লক্ষ্যে পড়িলেই সেই অসাবধানতার জন্য অতি সযত্ন গঠিত ক্ষেত্রনীতি এবং কৌশল ব্যর্থ হইয়া যায়।

যখন ইংরাজ বাহিনীদল বুয়ার বীর ক্রঞ্জিকে বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে সসৈন্যে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন ক্ষেত্র-নীতিবীৎ ডি-ওয়েট কিচেনারের শৃঙ্গ (Kitchenesr's Kopji) নামক গিরিশিখর পুনঃ পুনঃ অধিকার করতঃ ক্রঞ্জির উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত করিতে ছিলেন। "একবার এই অনুকূল গিরিশির শত্রু হস্তে পতিত হইলে দুই হাজার বুয়ার যোদ্ধা লইয়া ডি-

ওয়েট ইহা পুণরধিকার করিবার শেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহাকে সে যাত্রা অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। কিন্তু সেনানী থেয়ানিসেন একদল বুয়ার সহিত পলায়নে অক্ষম হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন; "Judging by their hot fire they were estimated to be several hundred strong, and the firing continued to be tolerablry heavy until about 1 P.M. A little while later when they had hoisted a white flag it was discovered that there had been, all the time, in the bush only 87 Boers, against whom a whole brigade had been deployed." বুয়ার পক্ষের ভীষণ আগ্নিধারা দেখিয়া ইংরাজ সেনানীগণ তাহাদিগের সংখ্যা কয়েক শত বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু যখন বহুক্ষণ ঘোর অগ্নিক্রীড়ার পর বুয়ারগণ শান্তিসূচক শ্বেতপতাকা উড়াইয়া আত্মসমর্পণ করিল, তখন দেখা গেল সেই ঘন লতা গুল্মে মাত্র ৮৭জন বুয়ার আছে। এই মুষ্টিমেয় বুয়ারের বিরুদ্ধে পাতলা রেখায় প্রায় দশ বার হাজার সেনা যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিল।" বর্ত্তমান ভীমশক্তি রণাস্ত্র লইয়া অতি সংগোপনে যুদ্ধ করিতে পারিলে, এই অস্ত্রের বল সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হয়; এবং যুদ্ধমান দলের সংখ্যা নিরূপণ করা অসম্ভব হয়।

ইংরাজ সৈন্যের সহিত যে জার্ম্মাণ সামরিক পরিদর্শক (military attahe) ছিলেন, তিনি এই ঘটনার বিষয়ে লিখিয়াছেন, "Even with strong glasses it was imposible to see individuals, and therefore no target was ordered for the English volleys. The Yorkshries

had hastily thrown up parapets of stone and......as soon as a man raised his head a little above the parapet in order to look about, bullets fell all around him, but it was impossible to see whence they came. The invisility of the enemy had the same depressing effect as in all the other actions." "অতি তীব্র দূরবীক্ষণ দ্বারাও লুক্কাইত বুয়ারগণকে দেখা যাইতেছিল না সুতরাং, সেনানীগণ স্বপক্ষের গুলি ধারার জন্য দূরত্ব নিরুপণ করিয়া কোন আদেশই দিতে পারিলেন না। আততায়ী ইয়র্ক-সায়ার সৈন্যদল বুয়ারগণের নিকটবর্ত্তী হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে প্রস্তর ভিত্তি গড়িয়া তাহার আশ্রয়ে সাজিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে কোন সৈন্য সম্মুখে লক্ষ করিবার জন ঈষৎ শিরাগ্রভাগও বাহির করিতেছিল, অমনি গুপ্ত স্থান হইতে অলক্ষ্যে গুলির রাশি আসিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে পড়িতেছিল। শত্রুর এই প্রকার আত্মগুপ্তির ফলে ইংরাজ সেনা বহু যুদ্ধক্ষেত্রের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও বড় ভীত ও বিমূঢ় হইয়া পড়িল।"

আত্মগুপ্তির ন্যায় মন্ত্রগুপ্তিও বড় আবশ্যক। কি উদ্দেশ্যে কোন্ লক্ষ্যে (objective) কোন্ কোন্ পথে সৈন্যদল গিয়া কোথায় সমবেত হইবে, এবং কিরূপ উপায়ে লক্ষীভূত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে তাহা সেনাপতিই স্থির করেন। তিনি সৈন্য বা সেনানীগণকে সে অভিসন্ধি না জানাইয়া অন্ধের ন্যায় লইয়া সেনাগণকে চালনা করেন। ক্রমে যখন সকল অয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া সৈন্য বাহিনী-গুলি কেন্দ্রীকৃত করিবার সময় আসে, তখন সেনাপতি মোহরবন্ধ পেটিকায় গুপ্ত পত্রদ্বারা (sealed letters) বিভিন্ন সেনানীদিগকে

নিজ কৌশল জানাইয়া অবিলম্বে তাহা কার্য্যে পরিণত করান। এইরূপ মন্ত্রগুপ্তির ফলে শত্রু প্রতি পক্ষের কোন কৌশলই পূর্ব্বে উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রতিকার করিতে পারে না, এবং সহসা বেঘোরে পড়িয়া পরাজিত হয়।

কামান ও সিপাহী সন্নিবেশ কেন্দ্রগুলির আত্মগোপন এবং সেনাপতির মন্ত্রগুপ্তির ফলে যেমন গতিবিধি ও অভিসন্ধি অজ্ঞাত রাখিয়া পদে পদে শত্রুকে ক্ষয়িতবল করা যায়, তেমনি তদুদ্দেশ্য সাধনের আরও দুই একটি অনুকূল উপায় আছে। কোন বাহিনী বা চমূ যখন পথ চলিতেছে, বা ব্যূহ খনন করিয়া শত্রুর অপেক্ষা করিতেছে তখন অগ্রে চরসৈন্য এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্রগামী সেনাদল চলে। ইহারা প্রায়ই অব্যর্থ সন্ধানী এবং যুদ্ধভূমির বর্ণের অনু-যায়ী তৃণ—হরিত, গৈরিক বা ধূসর বর্ণের উর্দ্দি পরিয়া যথাসাধ্য লুক্কাইত থাকিয়া অগ্রসর হয়। এই সকল রঙ্গিন পরিচ্ছদ-ধারীগণ যুদ্ধভূমির মৃত্তিকার সহিত সমবর্ণ বলিয়া দূর হইতে অনুভূত হয় না; ফিকা নীল উর্দ্দি ও আকাশের সহিত একবর্ণ বলিয়া দূরে বায়ুমণ্ডলে মিলাইয়া যায়। প্রচ্ছন্ন শত্রুকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করতঃ তাহার শক্তির পরিমাণ, সন্নিবেশ পদ্ধতি, অবস্থিতি স্থান এবং রসদাস্ত্র পথের সন্ধান লওয়াই ইহাদিগের কর্ত্তব্য; এবং সন্তর্পণে অগ্রগমনশীল কূটগতি আততায়ী আসিয়া অজ্ঞাতদিক হইতে ব্যূহবদ্ধ বা চলমান সেনাকে আক্রমণ না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা ইহাদিগের কার্য্য। আজকাল কালাস্ত্র-ধারী প্রচ্ছন্ন-শত্রু অতি ভীষণ পদার্থ; তাই শত্রু কোথায় কি অব-স্থায় ফাঁদ পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছে, তাহা জানা আবশ্যক। শত্রুর বন্দুকে ধূম হয় না যে তাহাতে শত্রু-ব্যূহের অবস্থিতি বুঝা

যাইবে ; রাইফেলের শব্দও ৮৮০ গজের ভিতর না হইলে শোনা যায় না, যে সেই শব্দে শত্রুর গুপ্ত আশ্রয় পরিলক্ষিত হইবে। এমন কি গুলিধারার শব্দও (volley fire) ১৩২০ গজের মধ্যে না হইলে কর্ণগোচর হয় না। সুতরাং চরসৈন্য এবং অগ্রগামী দলের কর্ত্তব্য কত দুরূহ ও দায়িত্বপূর্ণ তাহা সহজেই অনুমেয়।

অশ্বারোহী, অশ্বারূঢ় পদাতিক এবং পদাতিক এই তিনদলেই চরসৈন্যের কার্য্য করে। অশ্বারোহী এবং অশ্বারূঢ় পদাতিক দ্রুতগামী বলিয়া সেনা ভাবী যুদ্ধক্ষেত্রে চালনার বহুপূর্ব্বে তাহারা দলবদ্ধ এবং বিস্তৃতভাবে শত্রু সৈন্যের অবস্থিতি পদ্ধতি, সৈন্য-সন্নিবেশ, ক্ষেত্রগুলির রচনা, কামান-বহরের গুপ্ত স্থান, ও সংখ্যা বসদ পথ, এবং শত্রুসৈন্যের সংখ্যা যতদূর সম্ভব জানিতে প্রয়াস করে। অতি সংগোপনে অগ্রসর হইয়া কোন নিভৃত স্থানে অশ্ব হইতে অবতরণ করে, এবং নানা ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া রাই-ফেল (carabine) হস্তে দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ে। যদি শত্রু সতর্ক থাকে তাহা হইলে ক্ষুদ্র অথচ বহু-বিস্তৃত দলে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন বিযুক্ত হইয়া অগ্রসর হইলে চলে না। কারণ দূরক্ষেপী মসার হস্তে শত্রু নানা ঝোপে বনে শিলান্তরালে থাকিয়া চরদল একে একে নিকটে আসিলে অনতিবিলম্বে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। সে ক্ষেত্রে পরস্পর হইতে বিযুক্ত না হইয়া অশ্বারোহী পল্টন (squadron) শত্রুকে যুদ্ধ দান করিবে। যুদ্ধ করিয়া শত্রুকে নানা দিক হইতে বিস্তৃত অসংখ্য ক্ষুদ্র দলে বড়িয়া তাহাকে আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য করতঃ তথ্য সংগ্রহ করিবে। সঠিক তথ্য না হউক এই উপায়ে মোটামুটি শত্রুর সন্নিবেশ ব্যবস্থা ও সংখ্যা নিরূপণ করা যাইতে পারে। সংখ্যায়

সবল সেনানীদলও (officers'patrol) কখন কখন এইরূপ কৌশলে চরদলের কার্য্যে নিযুক্ত হয়; সৈন্য অপেক্ষা সেনানী শীঘ্র শত্রুর দুর্ব্বলতা, অবস্থিতি রীতি এবং অভিসন্ধি বুঝিতে পারে বলিয়া জার্ম্মাণ রণনীতিতে গোয়েন্দা সেনানীদলের (officers' patrol) স্থান অতি উচ্চ। সেনানী হউক বা সৈন্যই হউক, সতর্ক দূরসন্ধানী (shot at long range) শত্রুর বলাবল নির্ণয় করিতে হইলে তাহাদিগকে সংখ্যায় বহু, অনেক দূর অবধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং কূটবুদ্ধি হওয়া আবশ্যক। তাহাদের সহিত তারকর্ত্তন যন্ত্র (wire-cutter), উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ এবং পাল্লা-নিরূপণ যন্ত্র (range finder) থাকা আবশ্যক। ঝোপ, শিলা বাহুল্য, বনাকীর্ণতা বা ভূমির বন্ধুরতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক আশ্রয় না থাকিলে, চরদলের পক্ষে আত্মগোপন করতঃ শত্রুর সম্মুখীন হওয়া বড় দুরূহ হয়।

কেবল শত্রুব্যূহের সম্মুখে রহিয়া তথ্য সংগ্রহে (frontal reconnaisance) সংবাদ সঠিক হয় না, অশ্বারোহী পল্টনকে সদলে চর কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে হইলে (reconaisance in force) ছড়াইবার সময়ে যেমন সম্মুখে ছড়াইতে হয়, শত্রুর উভয় পার্শ্বেও তেমনি ছড়াইয়া চতুর্দ্দিকের সংবাদ সমভাবে গ্রহণ করিতে হয়। প্রতি পক্ষের অস্ত্রগতির মধ্যে অগ্রসর হইবার সময়ে বিস্তৃতি নিতান্ত আবশ্যক; নহিলে দূরসন্ধানী মসারধারীগণ অবলীলাক্রমে ঘনবদ্ধরেখা অশ্বারোহীকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিবে। রণনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ গবেষণা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, অর্দ্ধমাইল দূর হইতে অব্যর্থলক্ষ্য দূরসন্ধানী প্রচ্ছন্ন প্রতিপক্ষ ইচ্ছামত বাছিয়া বাছিয়া অশ্বারোহী

মারিতে পারে। ৩৩০ গজ দূর হইতে ৮০০ শত রাইফেলধারী একবার মাত্র যুগপৎ কাওয়াজ করিয়া (volley-fire) ৪২৪ জন অশ্বারোহীকে ধরাশায়ী করিতে পারে। সুতরাং প্রাকৃতিক আশ্রয় বাহুল্য না থাকিলে অশ্বারোহী অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া প্রতি পক্ষের রাইফেলের ৩৮৫০ গজের অধিক নিকটে যাইতে পারে না; তখন অশ্ব হইতে অবতরণ করতঃ অগ্রসর হওয়াই যুক্তি সিদ্ধ। ইংরাজ অশ্বারোহী চরকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বুয়ার রেখার ২০০০ গজের অধিক সন্নিধানে যাইতে পারিত না। আরও নিকটে যাইবার একান্তই আবশ্যক হইলে, একদল অশ্ব হইতে অবতরণ করতঃ শত্রুলক্ষ্যে গুলি বর্ষণ করিত, এবং অপর দল তাহার আশ্রয়ে অশ্বপৃষ্ঠে বা পদব্রজে অন্তরালে থাকিয়া অগ্রবর্ত্তী হইত। কিন্তু মোটের উপর ইংরাজগণ তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে বড় উদাসীন ছিল। এক জন বুয়ার পক্ষীয় জার্ম্মাণ যোদ্ধা এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "ইংরাজ চরদল সৈন্য ছাউনী হইতে প্রতিপক্ষের সংবাদ লইতে পাঁচ মাইল দূরেও যাইত না। বুলার, মাথুয়েন প্রভৃতি সেনাপতিগণ সৈন্য বা অশ্বারোহীর পথ-শ্রান্তি বা যুদ্ধভূমির প্রতিকূল প্রকৃতির দোহাই দিয়া অনেক সময়ে এই নিতান্ত আবশ্যকীয় কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতেন। যে প্রকারই যুদ্ধভূমি হউক, ইচ্ছা থাকিলে তন্মধ্যে নানা উপায়ে চর-কার্য্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে। বুয়ার ভূমি এত বন্ধুর যে অতি সন্নিকটেই কি আছে না আছে তাহা সহজে দেখা যায় না বটে, কিন্তু তেমনি আশ্রয় ও বন্ধুরতা থাকায় লুকাইয়া শত্রুর অতি নিকট অবধি যাইলেও তাহাদিগের অলক্ষ্যে আবার নিজ কার্য্য করিয়া ফিরিয়া আসা যায়।

চরসৈন্যের কর্ত্তব্য পদাতিকের দ্বারা যেরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, এরূপ আর কাহারও দ্বারা হয় না। অশ্বারোহী মোটামুটি শত্রুর অবস্থিতি, সংখ্যাদি নির্ণয় করিলে এবং যুদ্ধভূমির ও রণক্ষেত্রের প্রকৃতি ও প্রতিপক্ষের সংযোজক পথের সন্ধান দিলে তখন সঠিক সংবাদ আনয়ন চেষ্টা পদাতিককে করিতে হয়। পদাতিকেরও তথ্য সংগ্রহ নীতি পূর্ব্বোক্ত প্রকার। সতর্ক প্রতিদ্বন্দ্বীর সংবাদ লইতে হইলে পদাতিক সংখ্যায় বহু না হইলে সিদ্ধমোনোরথ হইতে পারে না। তবে প্রতিপক্ষ যদি অসাবধান থাকে বা চতুর্দ্দিকের ভূমি যদি উচ্চ নীচ ও খাতস্তুপবনময় হয় তাহা হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন দলও তাহার সন্ধান লইতে সমর্থ হয়। পদাতিক চরসৈন্যও নিজ কর্ত্তব্য সুসিদ্ধ করিবার জন্য যেরূপে প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখভাগের তথ্য সংগ্রহ করিবে, সেইরূপ তাহার বামে দক্ষিণে এবং পশ্চাতে যতদূর সম্ভব সন্নিহিত হইয়া শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ করিবে।

আজকাল তথ্য সংগ্রহের জন্য এক অভিনব উপায় পরিগৃহীত হইয়াছে। পদব্রজী বা অশ্বারূঢ় চরসৈন্য কোন উপায়েই যখন সুরক্ষিত ও প্রচ্ছন্ন শত্রুর গতিবিধি ও অবস্থিতির সন্ধান লইতে পারে না, তখন ইহারা ব্যোম-যানে উঠিয়া আকাশ পথ হইতে প্রতিপক্ষের কৌশল লক্ষ্য করে। এই ব্যোম-যান যুদ্ধক্ষেত্রের অনতিদূরে শত্রুর রাইফেল ও কামানের পাল্লার বাহিরে কোন অনুকূল স্থানে রক্ষিত হয়। গোয়েন্দার কার্য্যে নিযুক্ত কতিপয় সেনানী বা চরসৈন্য ইহাতে আরোহণ করিলে সেই উড্ডীয়মান ব্যোম-যান ভূমির সহিত স্থূল ও দীর্ঘ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করা হয়। এইরূপে স্থিতিশীল অথচ উর্দ্ধে উড্ডীন ব্যোম-যানে রহিয়া প্রচ্ছন্ন

কূটবুদ্ধি শত্রুর পদ্ধতি ও ছিদ্রাদি লক্ষ্য করতঃ চরগণ আলোক-সঙ্কেত (heliograph) বা ধ্বজ সঙ্কেত (flag signal) দ্বারা তাহা যোদ্ধৃগণকে জ্ঞাপন করে। ইংরাজ সেনা যখন বুয়ার-কেশরী ক্রঞ্জিকে বেষ্টন করিয়াছিল, তখন পার্ডবার্গের (রণক্ষেত্র) এক মাইল দক্ষিণে এইরূপ রজ্জুবদ্ধ বন্দী ব্যোমযান (captive Balloon) রাখিয়া ইংরাজ আততায়ী অবরুদ্ধ বুয়ারগণের অনেক কৌশল উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বুয়ারগণ রাইফেল মুখে উপর্যুপরি গুলি বর্ষণ করিয়াও সে ব্যোমযানকে ধরাশায়ী করিতে পারে নাই। মাঞ্চুরীয় সমরে জাপানীগণও এই উৎকৃষ্ট পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যোম-যান ব্যবহার করিয়াছিল। "An interesting feature of the operations on August 30th was the employment by the Russians of a captive balloon for the purpose of observing the enemy's movements. It would be difficult to imagine a case in which aerial reconnaissance would be more useful than it must have been in this. Evidently the Balloon scouts caused General Oku active annoyance for he speaks of them as frequently modifying the tactics on the various fronts. General Oku resented the presenee of these inconvenient scouts, to whom most of his manœuvres in the tall millet patches must have been easily discernible," লিয়াও-ইয়াংএর যুদ্ধে সময়ে রুষগণ একটি বন্দী ব্যোম-যানে (captive balloon) আরোহণ করিয়া জাপানী সেনাপতি ওকুর নানা কৌশল দেখিয়া

লইতেছিল। রুষ সৈন্য পর্ব্বতের শিখরে শিখরে অবস্থিত, এবং আততায়ী ওকু নিম্নের শষ্যক্ষেত্রের অন্তরালে সৈন্য সন্নিবেশ করতঃ আক্রমণের আয়োজন করিতে ছিলেন, সুতরাং বন্দী ব্যোম-যানের দ্বারা আকাশ পথে তথ্য সংগ্রহের জন্য এরূপ অনুকূল অবসর সহজে মিলে না। এই শ্যেনদৃষ্টি চরগণের জন্য কৌশলী ওকুকে পুনঃ পুনঃ নিজ ক্ষেত্রনীতির (tactics) পরিবর্ত্তন করিতে হইতেছিল।

নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রতন্ত্রের আবিষ্কারে এইরূপে তথ্য সংগ্রহ ব্যাপার অনেকাংশে পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ হইয়া আসিয়াছে। দ্বিচক্র যান, বার্ত্তাবাহক পারাবত, তাড়িৎ বার্ত্তাবহ (field telegraph) টেলিফোন, আলোক সংকেত (heliograph), ধ্বজ সঙ্কেত (flag signalling), যুদ্ধক্ষেত্র আলোকিত করিবার জন্য তারকা-শেল (star shell), যন্ত্রজ আলোক (search light), দূর হইতে সন্নিবেশ কেন্দ্রাদি অধ্যয়ন করিবার জন্য ফটোগ্রাফি যন্ত্র এবং শত্রুকে লক্ষ্য করিবার উপায় স্বরূপ কৃত্রিম মঞ্চাদির (observation scaffolding, ladders, watch tower &c) সহায়তায় কূটকৌশলী চরদলের পক্ষে প্রতি পক্ষের অভিসন্ধি বুঝা কিছুই কঠিন নহে।

আয়োজন-নীতির শেষ কথা যুদ্ধশীল চমূর পশ্চাতের সংযোজক পথ। নেপথ্য ভূমির (base of war) প্রধান কেন্দ্রে যুদ্ধার্থ যুযুৎসুর স্বদেশ হইতে আনীত রসদ, অস্ত্র, সেতু উপকরণ ও নূতন সৈন্যাদি আসিয়া সঞ্চিত হয়। সুতরাং যুযুৎসুর স্বদেশ হইতে নেপথ্য ভূমির প্রধান কেন্দ্র অবধি এই যে মার্গ ইহারই আখ্যা সংযোজক পথ (line of communication)। কিন্তু আবার

এই কেন্দ্র হইতে যুদ্ধভূমি (theatre of war) ভেদ করিয়া যে পথ গিয়াছে, যে পথে আবশ্যক মত রণসম্ভার ও নূতন সৈন্য সাহায্য রণক্ষেত্রে প্রেরিত হয়, তাহাও সংযোজক পথের (line of communication) অন্তর্গত এবং পথের সেই অংশই সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ-সঙ্কুল। শত্রুপক্ষীয় অগ্রগামী সেনাদল (advanced flying columns) অবসর পাইলেই অতর্কিত আগমনে এই পথের সেতুগুলি ভাঙ্গিয়া তাহা অব্যবহার্য্য করিয়া দেয় এবং গুপ্তচরের দ্বারা সন্ধান পাইলে বৃহৎ রসদ ও অস্ত্রবাহীদলকে সহসা আক্রমণে পরাস্ত করতঃ সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায় বা তাহা অসম্ভব হইলে সেই রণসম্ভার তৎক্ষণাৎ অগ্নিতে দগ্ধ করতঃ নষ্ট করিয়া ফেলে। হয় ত রণক্ষেত্রে এবং সমগ্র যুদ্ধভূমে দুই তিন লক্ষ সেনা এই পথে আনীত খাদ্য ও রণোপকরণের উপর নির্ভর করিয়া আছে; এমত অবস্থায় সামগ্রী ও সৈন্য প্রেরণ মার্গ কয়েক দিনের জন্যও রুদ্ধ করিয়া দিলে খাদ্যাভাবে অস্ত্রাভাবে এবং আবশ্যকীয় নূতন সৈন্য সহায় অভাবে যুদ্ধ্যমান সেনা বিকল ও ক্ষীণ-শক্তি হইয়া পড়ে। অতএব এই পথ সুরক্ষিত রাখিতে হইলে সংযোজক মার্গের সকল স্থানে সৈন্য সন্নিবেশ করিতে হয়, প্রত্যেক সেতু ও রেলবর্ত্মের প্রত্যেক সংযোগ-মুখ এবং প্রত্যেক রসদাস্ত্রের সঞ্চয় স্থান (depot) যথেষ্ট সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সংযোজক পথ রণক্ষেত্র হইতে যত দূরবর্ত্তী হয়, ইহার রক্ষার জন্য তত অধিক সৈন্য ব্যয় হয়। সুতরাং উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের মধ্যে যাহার সংযোজক মার্গ যত দীর্ঘ ও বহুশতক্রোশ ব্যাপী, তাহার দুর্ব্বলতা ও বিপদ সম্ভাবনা তত অধিক। দীর্ঘ পথে সৈন্য নিয়োগ করিতে করিতে রণক্ষেত্রে

বহু অক্ষৌহিনী কেন্দ্রীকৃত করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, এবং শত্রু একবার ছিদ্র পাইয়া কতক রসদ অস্ত্র ও বহন পথ নষ্ট করিয়া দিলে তজ্জন্য অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতে হয়। মাঞ্চু সমরে রুষপক্ষের সংযোজক পথের অতিদীর্ঘতা তাহার পরাজয়ের এক প্রধান কারণ ছিল। জাপান নিজ নেপথ্যভূমি লিয়াওইয়াংএ স্বদেশ হইতে মাত্র সাত দিবসের মধ্যে যথেচ্ছা সৈন্য ও দ্রব্যাদি আনিয়া ফেলিত; কিন্তু সুদূর রুষ রাজধানী সেণ্ট পিটার্স্‌বার্গ হইতে তাহাদিগের নেপথ্যকেন্দ্র মুকডেনে রণসম্ভার ও সেনা সাহায্য আসিতে দুই মাস অবধি সময় লাগিত। রুষ সংযোজক পথের ভারপ্রাপ্ত প্রধান যন্ত্রক প্রিন্স্‌ খিকফ্‌ অতি কর্ম্মঠ, দক্ষ এবং শিল্পনিপুণ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার অপূর্ব্ব অধ্যবসায় ও পূর্ত্ত-চাতুর্য্যের (engineering skill) ফলেই সম্রাট জারের সৈন্য মুখের অন্ন ও প্রাণরক্ষার অস্ত্র পাইয়াছিল। এই সহস্র সহস্র ক্রোশব্যাপী পথের মধ্যস্থলে বৈকাল হ্রদ অবস্থিত; এই হ্রদ ছয় মাসের অধিক কাল হিমানী কঠিন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে রুষগণের একটি জাহাজ ছিল, এই জাহাজ ইহার তলসংলগ্ন তীক্ষ্মমুখ যন্ত্র সাহায্যে জমাট বরফ কাটিয়া যাতায়াত করিত। যুদ্ধের সময়ে এই তুষারভেদী জাহাজ (ice breaker) প্রতিদিন মাত্র ৭৫ খানি গাড়ী (carriage) যুক্ত একটি ট্রেণ পার করিয়া দিত। কিন্তু প্রিন্স খিকফ্‌ যুদ্ধের শেষভাগে বৈকাল বেষ্টন করিয়া স্থলপথে তাঁহার কল্পিত রেলবর্ত্ম সম্পূর্ণ করিয়া আনিলেন। এই পথযোগে প্রতিদিন ৩০০ গাড়ি-যুক্ত একটি ট্রেণ বৈকাল উত্তীর্ণ হইত। এই ৭৫ ক্রোশ ব্যাপী ৩৩টি পর্ব্বতভেদী রন্ধ্রপথ (tunnels) যুক্ত অপূর্ব্ব বর্ত্ম তৈয়ার করিতে রুষগণের নয় কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

জাপান সমরের প্রারম্ভেই রুষ নৌশক্তি প্রায় উৎসন্ন করিয়া দেওয়ায় জলপথে তাহার রণসম্ভার ও সেনা নির্ব্বিবাদে যুদ্ধভূমিতে আসিত। কিন্তু তথাপি এই নির্ব্বিঘ্নতা বিষয়ে অন্ধবিশ্বাসী জাপান নিজ সংযোজক পথের সুরক্ষায় অবহেলা করার ফলে এক দিন ভ্লাদিভোস্তক রণতরী আসিয়া একটি রসদবাহী জাপানী তরী ডুবাইয়া দেয়। এই "হিতাচী মারু" তরীর সহিত জাপানের বহু উৎকৃষ্ট অবরোধক কামান (Siege guns), দুইটি কামানধারী ট্রেণ (armoured trains) এবং রেল বর্ত্মের নানা উপকরণ সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হয়। ইহার ফলেই পোর্ট আর্থার দুর্গের বিজয়ে বিলম্ব হইয়াছিল।

কলেঞ্জো যুদ্ধের পর ইংরাজ পক্ষের সেনাপতি লর্ড মেথুয়েন কুচ করিবার সময়ে পথে জলকষ্ট হইবে জানিয়া তাহার বিশাল রসদবাহী দলকে সঙ্গে না লইয়া সামান্য কতকগুলি খচ্চর ও বাহক লইয়া ছিলেন। এই জন্য পদে পদে শত্রু হস্তে নির্য্যাতিত হইয়াও তাঁহাকে রসদ সরবরাহ অবাধ রাখিবার জন্য রেল পথের সন্নিধানে রহিয়া চলিতে হইয়াছিল; বুয়ার স্বল্পাহারী, সহিষ্ণু ও ক্ষিপ্রগামী, সুতরাং তাহাদিগের রসদবাহী দল বা রেল সাহায্যের আবশ্যক হইত না। এরূপ শত্রুকে পরাস্থ করিতে হইলে রসদ পথের উপর অতিমাত্র নির্ভরশীল হইলে চলে না, যতদূর সম্ভব আবশ্যকীয় সামগ্রী সঙ্গে রাখিয়া অনন্যচিন্ত্য হইয়া শত্রুনাশ করিতে হয়। "It confirms impressively the old lesson of the necessity of always keeping a watchful eye on the rear, however much the attention may be concentrated towards the front. It is imposible

ever to study with sufficient care and detail the arrangement for the safety of the lines of communication."
যুদ্ধের ব্যস্ততা বা কুঁচ করিবার কালীন সাবধানতা হেতু সেনাপতির দৃষ্টি যতই কেন না সম্মুখে আবদ্ধ থাক, পশ্চাতের সংযোজক পথে তীব্র মনোযোগ রাখিতেই হইবে। এই পথ রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা ও যত্নই যথেষ্ট নহে, কারণ যুদ্ধ্যমান সেনার প্রাণ এই পথের নির্ব্বিঘ্নতার উপর নির্ভর করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সেনার নিয়ন্তা তাহার চতুর দক্ষ নীতিজ্ঞ সেনানীদল, সেনার চক্ষু তাহার কূটবুদ্ধি চর সৈন্যগণ, সেনার আশ্রয়প্রদাতা ও ব্যূহরচয়িতা তাহার কর্ম্মঠ খনক শিপাহী এবং তাহার প্রাণসঞ্চারিণী নাড়ী তাহার যন্ত্রক-সেনা রচিত সৈন্যসুরক্ষিত সংযোজক পথ। যে সেনার এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবল সুস্থ ও কর্ম্মপটু আছে সেই সেনাই যুদ্ধ-ভূমে বিজয় লক্ষ্মীর বরেণ্য হয়।
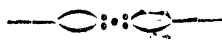
দ্বিতীয় খণ্ড।

ক্ষেত্র-নীতি ও সমর-ক্রিয়া কৌশল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:o:—
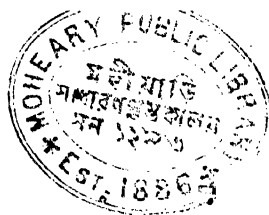
ক্ষেত্র-নীতি বা আয়োজন-নীতির শেষার্দ্ধ।

অস্ত্রের মুখ হইতে সৈন্য রক্ষা করতঃ শত্রুর অভিসন্ধি বুঝিয়া সেই সৈন্য কি কি উপায়ে বলে বীর্য্যে আত্মবিশ্বাসে ও দ্রব্যসম্ভারে সর্ব্বদা রণোপযোগী অবস্থায় রাখিতে হইবে তাহা আমরা প্রথম খণ্ডে আংশিক ভাবে আলোচনা করিয়াছি। ইহা ব্যতীত আয়োজন-নীতির আরও কতকগুলি উপায় আছে, যাহার প্রয়োগে যুগপৎ আত্মবল বৃদ্ধি এবং শত্রুর অবসর ও সুবিধা হরণ করিয়া প্রতিপক্ষের অবস্থা শোচনীয় করা যাইতে পারে। প্রতিপক্ষ স্বভাবতঃই নানা বল সঞ্চয় করতঃ কূট কৌশলের দ্বারা বিজয়লাভের অনুকূল অবস্থা গড়িয়া লইয়া তবে আক্রমণে অগ্রসর বা যুদ্ধগ্রহণে প্রস্তুত হয়; সেই অবস্থায় তখনই তাহাকে যুদ্ধদান করিলে কেবল প্রহার ও প্রতি-প্রহারে তাহার বল ক্ষয় করা কঠিন হইয়া উঠে। রাইফেলের আঘাত, তোপশ্রেণীর অগ্নিক্রীড়া, অশ্বারোহীর প্রচণ্ড আক্রমণ বা পদাতিকের প্রধাবনেই কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী পশ্চাদ্‌পদ হয় না, অনুকূল

অবস্থার মধ্যে রহিলে উপর্য্যুপরি আক্রমণ সহিয়াও সে অটল অচল থাকিতে পারে। এই জন্য যুদ্ধ ঘটাইবার পূর্ব্বে আয়োজন-নীতির সুসিদ্ধ নানা কৌশল অবলম্বনে শত্রুর অবস্থা তাহার পক্ষে জয়শ্রী লাভের প্রতিকূল করিয়া আনিতে হয় এবং যতদূর সম্ভব তাহার শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতে হয়। এতদর্থে এ যাবৎ জগতের সামরিক দ্বন্দ্বক্ষেত্রে নানা উপায় পরিগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্ন লিখিতগুলিই উল্লেখযোগ্য ;—১। যবনিকার অন্তরালে (behind a screen) গতিবিধি ও ক্রিয়া ; ২। শত্রুকে প্রতিকূল ক্ষেত্রে রহিয়া যুদ্ধ গ্রহণ করিতে বাধ্য করণ ; ৩। পথ অতিবাহনে সেনা বিভাগ ও একীকরণ কৌশল ; ৪। জার্ম্মান আয়োজন-নীতিজ্ঞ ক্লজেউইট্‌জের উপদিষ্ট রীতির অনুসরণ। এইরূপে যে যে উপায় অবলম্বনে শত্রুর বলক্ষয় করতঃ তাহার পরাজয় স্বতঃসিদ্ধ করিয়া আনা যায় তাহাকেই আয়োজন-নীতি বলে।

সেনা যখন শত্রুর দেশে আসিয়া যুদ্ধভূমি রচনা করে, অথবা ব্যূহবদ্ধ (fortified) প্রতিপক্ষের প্রতি অভিযান (invasion) করিবার উদ্দেশে ধাইয়া চলে, তখন সেই রণোন্মুখ সেনার লক্ষীভূত লক্ষ্যসন্ধি (objective) যেমন গুপ্ত রাখিতে হয়, তাহার গতিবিধি, [illegible] ও [illegible] প্রভৃতিও তেমনি নানা কৌশলে প্রচ্ছন্ন রাখিতে হয়। এই জন্য সেনা অধিকাংশ সময়ে নিশার অন্ধকারেই চালনা করিতে হয়, কারণ নিশার তমিস্রাগর্ভে লুকাইয়া শত্রুর চরগণের অলক্ষ্যে বহুদূর পথ চলিয়া যাওয়া যায়। কিন্তু যখন দিকে দিকে

ত্বরিত গতিতে সৈন্যদল প্রক্ষেপ করিয়া ব্যাপক এবং হয়ত আপাত-বিভক্তবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পুনঃ পুনঃ পরাজিত করিতে হইবে, তখন কেবল রাত্রিযোগে চলিলে কার্য্যে বিলম্ব ঘটিয়া যায়, দিবাভাগেও সৈন্য চালনার আবশ্যক হইয়া পড়ে। দিবসে গতিশীল সৈন্যকে শত্রুর চক্ষু হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিতে হইলে প্রথমতঃ কোন পর্ব্বতমালা, নিম্ন অধি-ত্যকা বা বন্ধুর ভূমির খাতগর্ভ বা বনাবরণকে অন্তরাল করিয়া জনহীন বিপথে রহিয়া রহিয়া লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হইতে হয়। বুয়ার এবং রুষ-জাপান সমরে অনেক সময়ে এক পক্ষ অন্যপক্ষের অতি সন্নিকটে থাকিয়াও দুই তিন হস্ত উচ্চ শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রকেই (tall maiz) অন্তরাল করিয়া এরূপ কৌশলে সেনা চালনা করিয়াছিল, যে, প্রতিপক্ষ শত চেষ্টায়ও সে অভিসন্ধি ভেদ করিতে পারে নাই। ইয়ালু নদী উত্তীর্ণ হইবার সময়ে জাপানীদিগকে ইয়ালুর অনাবৃত প্রান্তরবহুল দক্ষিণতটে থাকিয়া রণসজ্জা ও সৈন্য-সন্নিবেশ করিতে হইয়াছিল। এই ধূর্ত্ত জাপানীগণ কামান-কেন্দ্র ও সেনা-অবস্থিতি স্থান প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য নদীর তীরে তীরে মৃত্তিকার উচ্চ বাঁধ দিয়া লইয়াছিল। বলা বাহুল্য এই প্রকার কৃত্রিম বা অকৃত্রিম যবনিকা বা আবরণের আশ্রয়ে থাকিয়া সেনা চালনা সমাবেশাদি করিলেই মন্ত্র-গুপ্তি ও আত্মগোপন নীতি পূর্ণাঙ্গ হয়। আরও একপ্রকার আবরণ আছে তাহার নাম দূরপ্রসারী রণরেখা (far-flung battle-line)। অশ্বারোহী চরদল (cavalry vedettes) এবং নাসীরদল (advan-

ced guard) অগ্রগামী চলমান সেনার চতুর্দ্দিকে ক্রমবর্দ্ধিত বৃত্তের আকারে বেড়িয়া অগ্রসর হয়। অক্ষৌহিণী বা অনীকিনীর চতুর্দ্দিকে পনর বিশ মাইল অবধি পাতলা রেথায় জালের ন্যায় ছাইয়া অগ্রগামী সৈন্যদল (advanced guard) চলে, এবং তাহার বাহিরে গুল্ম সৈন্যদল (outposts) ও অশ্বারোহী চরগণ (vedettes) প্রতি ভূমি-খণ্ড তন্ন তন্ন রূপে অন্বেষণ করিতে করিতে অগ্রসর হয়। এই বিশাল জাল (thin screen) ভেদ করিলে বা বলপ্রয়োগে সঙ্কুচিত করিয়া আনিলে তবে শত্রু সে বৃত্ত পরম্পরা-বেষ্টিত কেন্দ্রস্থ সেনাকে স্পর্শ করিতে পারে। সেনাগুপ্তিকৌশলে মারাঠা বীরগণ অতিশয় দক্ষ ছিলেন। বাদশাহের বিলাসী আলস্যমন্থর কূর্ম্মগতি মোগল সেনা চরনিয়োগ করিয়াও এই কৌশলী বীরদলের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে পারিত না, পদে পদে অতর্কিত আক্রমণে প্রাণ হারাইত।

এই প্রকারে যবনিকার অন্তরালে রহিয়া সেনা-গুপ্তির ফলে প্রতিপক্ষ বুঝিতে পারে না যে কত সেনা কি কি অস্ত্র লইয়া কোন্ পথে আসিতেছে; পূর্ব্বে সন্ধান না পাওয়ায় তাহার গতিরোধ বা পরাজয়ের কোন আয়োজনই করিতে সমর্থ হয় না এবং অতর্কিতভাবে আততায়ীর সম্মুখে পড়িয়া যে কোন স্থলেই যুদ্ধ দান করিতে বাধ্য হয়। জয়শ্রীলাভের প্রধান মন্ত্র অনুকূল যুদ্ধক্ষেত্র নির্ব্বাচন, একথা পূর্ব্বেই বিবৃতরূপে প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। প্রতিপক্ষ আত্মরক্ষার উপযোগী ও আক্রমণের অনুকূল রণস্থল পাইলে তাহাকে পরাজিত করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে, যদিই বা সম্ভব হয় তাহা হইলেও

জেতাকে তজ্জন্য বহু সৈন্য, অস্ত্র ও রসদ ক্ষয় করিতে হয়। সুতরাং যুদ্ধার্থীর কর্ত্তব্য যে সে নানা কৌশলে ও অভিসন্ধির দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রতিকূল ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া বহু অসুবিধার মধ্যে রণে নিযুক্ত হইতে বাধ্য করিবে। যথায় সমর-ভূমি (theatre of war) রচিত হইবার সম্ভাবনা আছে,যে পক্ষ চতুরতার সহিত বহুপূর্ব্ব হইতে সেই দেশের ভূমির আকৃতি প্রকৃতি বিষয়ে তথ্য ও তাহার নানা মানচিত্র রেখা-লিপি সংগ্রহ করিয়া রাখে, সেই পক্ষই যদৃচ্ছা অনুকূল ভূমিগুলি পূর্ব্ব হইতেই হস্তগত করিয়া শত্রুর সুবিধা হরণ করিয়া লয়। শত্রু তখন বাধ্য হইয়া যে কোন স্থানে যথাসম্ভব সৈন্য সমাবেশ করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়। জলবহুল, আশ্রয়বহুল, উর্ব্বর, নির্ব্বিঘ্ন সংযোজকপথযুক্ত ভূমি না পাইলে অতি বীর্য্যবান রণপটু সেনাও আত্মরক্ষা পর্য্যন্ত করিতে পারে না। নেপাল ও আফগান দেশে ইংরাজের নির্য্যাতনের ইহা এক মূল কারণ; উক্ত দুই দেশ সর্ব্বগ্রাসী রাষ্ট্রলোলুপ ইউরোপের কুক্ষিগত যে আজও হয় নাই, তাহা কেবল ঐ দেশদ্বয় পর্ব্বতসঙ্কুল ও আত্মরক্ষার উপযোগী বলিয়া ; এই জন্য কবিগণ স্বাধীনতা-লক্ষ্মীর আসন কাননকুন্তলা শৈলবন্ধুরা বনভূমে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

প্রতিপক্ষকে প্রতিকূল রণভূমি ও যুদ্ধক্ষেত্র গ্রহণে বাধ্য করিতে হইলে আর একটি কার্য্য করিতে হয়। যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিলেই অবিলম্বে নিজ সেনাপ্রবাহ লইয়া বিদ্যুদ্গতিতে যাইয়া তাহারই দেশ আক্রমণ করিতে হয় ; তাহা হইলে নিজ জন্মভূমে রণস্থল

ও যুদ্ধভূমি রচিত না হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর দেশেই হইয়া পড়ে। যে দেশে দীর্ঘ সমরের অবতারণা ঘটে সে দেশে দুর্গতির অবধি থাকে না। উভয় পক্ষের সেনা চলাচলে কৃষিকার্য্য বন্ধ হইয়া যায়, প্রজাকুলের ধনপ্রাণ নষ্ট হয়, এবং ব্যবসা বাণিজ্য রুদ্ধ হইয়া দেশকে শ্রীহীন ও বিপন্ন করিয়া তোলে। সুতরাং ছিদ্রান্বেষী কৌশলী যুদ্ধার্থী কখন সম্ভবপক্ষে নিজ দেশে যুদ্ধ ঘটিতে দিবে না। যত দিন সম্ভব যুদ্ধসীমা শত্রুর অধিকারে আবদ্ধ রাখিবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সমর ঘোষণা হইবার পরক্ষণেই ক্ষিপ্রগতি বুয়ার নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া আচম্বিতে ইংরেজাধিকৃত নাটালে আসিয়া আক্রমণ করিয়াছিল ; ইহার ফলে দীর্ঘকাল অবধি ইংরাজ রাজ্য নাটালই বুয়ার-সমরের যুদ্ধভূমি ও রণক্ষেত্র ছিল ; বুয়ার পক্ষের নেপথ্যভূমি (base of war) ছিল ড্রাকেনসবার্গ গিরিমালার পরপারস্থ অরেঞ্জ ফ্রিষ্টেট। এই চতুর কৌশলের ফলেই সার্দ্ধ তিন মাস কাল ইংরাজকে অশেষ দুঃখ সহ্য করিতে হয়।

পরে পরে দুই তিনটি অক্ষৌহিণী (armies) লইয়া এক বিরাট সেনা গঠন করতঃ যদি শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হয়, তাহা হইলে সে মহতী সেনাকে একত্র একই পথে চালনা করা অনুচিত। একটি অক্ষৌহিণী দৈর্ঘ্যে ৮।১০ মাইল স্থান ব্যাপিয়া থাকে, সুতরাং ২।৩টি অক্ষৌহিণী একত্র চালনায় অনেক অসুবিধা, এত বড় সেনার গতিবিধি প্রচ্ছন্ন রাখা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে, একত্র চলিলে ইহার গতি

স্বভাবতঃই মৃদু হইয়া পড়ে এবং ইহার রসদ ও দ্রব্যসম্ভার যোগান এত কঠিন হয় যে সমস্ত রসদ বিভাগের কর্ম্ম উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্ব্বহ হইয়া যায়। রসদ যাহা যুদ্ধার্থীর দেশ হইতে আনীত হয় সেনার অভাব দূরীকরণ প্রধানতঃ তাহারই উপর নির্ভর করিলেও স্থানীয় সাহায্যও পরিত্যাজ্য নহে; পথে যাহা পাওয়া যায় তাহা বিপদাপদের জন্য সঞ্চিত ও ব্যয়িত হয়, অনেক সময়ে স্থানীয় লভ্য রসদে নির্ভর করিয়া রসদ বিভাগকে দুই দশ দিনের জন্য অব্যাহতি দিলেও কার্য্যের অনেক সুবিধা হইয়া আসে। কিন্তু তিন চারিটি অক্ষৌহিণী বা অনীকিনী একই পথে চলিলে দেশের সমস্ত প্রাপ্য রসদ পাওয়া যায় না, কেবল সেই পথের চতুস্পার্শের খাদ্যসম্ভার নিঃশেষে ফুরাইয়া যায় মাত্র। ইহা ব্যতীত বৃহৎ সেনাকে বিভক্ত অবস্থায় লইয়া অগ্রসর হইলে তাহার গতিবিধি গুপ্ত রাখা অতি সহজ। যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধভূমে রেল বা টেলিগ্রাফ থাকে না, সুতরাং এই সকল বিভক্ত বলকে বহুকাল গুপ্ত রাখা যায় এবং যথা সময়ে যে কোন স্থানে সংখ্যায় বিপুল শত্রুর সম্মুখে একত্র করা যায়। সমুদ্রগামী নদীর সহিত যেমন ক্রমে একটির পর একটি ধারা আসিয়া মিলিত হয় এবং অল্পতোয়া নদীকে মহানদে পরিণত করতঃ সাগর সঙ্গমে উপস্থিত করে, এই সেনা বিভাগ একীকরণও ঠিক তেমনি ব্যাপার। প্রথমে একটি অক্ষৌহিণী অগ্রসর হয়, তাহার পর যেমন শত্রু হটিতে হটিতে ক্রমেই বিপুল হইতে বিপুলতর সংখ্যায় জুটিয়া গতিরোধ করে, তেমনি এই আততায়ী অক্ষৌহিণীও নানা ধারার সংযোগে বর্দ্ধিত হইতে হইতে চরম লক্ষ্যে তাহার নিখিল বল

লইয়া উপস্থিত হয়। এই পদ্ধতির নিয়োগে আর একটি উপকার আছে; একটি সেনা চার পাঁচটি খণ্ডে নানাপথে চরম লক্ষ্যে যাইলে সমস্ত যুদ্ধভূমিই (theatre of war) নিঃশেষে ক্ষিপ্রহস্তে শত্রুশূন্য করা যায়। জাপানীরা এই নীতির প্রয়োগে মাঞ্চুরিয়া রুষ হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। একটি অক্ষৌহিণী ঋজুপথে ইয়ালু উত্তীর্ণ হইয়া খণ্ড যুদ্ধ জয় করিতে করিতে লিয়াওইয়াংএর পথে ফেনহোয়াংচেংএর সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেনাপতি কিউরোকী এই স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কারণ সেনাপতি ওকু পোর্ট আর্থার বন্দর অবরোধ করিয়া তখনও আসিয়া জুটিতে পারেন নাই। পরে এই উভয় সেনা একত্র হইয়া লিয়াও-ইয়াং জয় করতঃ অগ্রসর হইতে হইতে আর একটি অক্ষৌহিণীর সহিত মিলিত হইল। এইরূপে যখন তাহারা চরম লক্ষ্য মুকডেনে পঁহুছিল, তখন তাহাদের সকল অক্ষৌহিণীগুলিই কেন্দ্রীকৃত হইয়া রণসজ্জায় সাজিয়াছে। এই সেনা পৃথগীকরণ একীকরণের মূলে আরও তত্ত্ব নিহিত আছে তাহা প্রকৃত পক্ষে ক্ষেত্রনীতির অন্তর্গত বলিয়া এস্থানে উল্লিখিত হইল না।

জার্ম্মাণ রণপণ্ডিত ক্লজেউইটজ তাঁহার দেশে আয়োজন-নীতির সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহারই প্রচলিত আদর্শে আজ কাল জার্ম্মান সেনা শিক্ষিত হইতেছে। জাপানে ১৮৭৪ সালে যখন conscription পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল, তদবধি জাপানী সেনাও জার্ম্মান রণনীতির পক্ষপাতী। যুদ্ধকালে অনুসরণীয় লক্ষ্য অতি ব্যাপক ও মহান হইবে এবং প্রত্যেক সেনাপতি নিজ নিজ

কর্ত্তব্য বুঝিয়া লইয়া তৎসম্পাদনের পূর্ণ দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিবে ইহাই ক্লজেউইট্জ-প্রচলিত আয়োজন-নীতির পরাকাষ্ঠা। জাপান এই নীতির শিক্ষক এবং মানচুরীয় সমরভূমে জাপানই ইহার প্রতিপাদক। জগতের মল্লভূমে এ পদ্ধতি দুইবার মাত্র অবলম্বিত হইয়াছে, একবার ফ্রাঙ্কো জার্ম্মান সমরে ইহার উদ্ভাবয়িতা জার্ম্মানীর দ্বারা এবং দ্বিতীয়বার মাঞ্চুরিয়ার রণস্থলে প্রাচ্যশিষ্য জাপানের দ্বারা। কোন কোন ক্ষেত্রে আততায়ী কয়েকটী যুদ্ধে (battle), ক্ষিপ্রহস্তে, জয়শ্রী করায়ত্ব করিয়া শত্রুকে একেবারে নির্জীব করিয়া ফেলিবে ভাবিয়া সমরক্রীড়া আরম্ভ করে। কিন্তু উক্ত দুইটি সমরে তাহা হয় নাই; আততায়ী এক পূর্ব্ব-কল্পিত বিরাট ব্যাপক অভিসন্ধি (plan of campaign) স্থির করিয়া বরাবর তাহারই অনুসরণ করিয়াছিল। এই পূর্ব্বকল্পিত অভিসন্ধির প্রয়োগে ধীরে ধীরে সযত্নে সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া যুদ্ধের পর যুদ্ধে শত্রু রেখা পরাজিত করিতে করিতে তদ্দেশ নিঃশেষে শত্রুশূন্য করায় এবং স্থায়ী পূর্ণাঙ্গ জয়লাভেই ক্লজেউইট্জের আয়োজন-নীতির স্বার্থকতা। "The case is rather similar to that of a fine piece of machinery, the various parts of which have to be produced separately in different workshops before they come to be finally assembled into the complete engine. It may happen that an injury to some small part prior to assembly may cause more harm than a final failu-

re." "একটি দীর্ঘ জটিল যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার সময়ে তাহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন স্থানে নির্ম্মাণ করিতে হয়, এবং সেই খণ্ডাংশগুলি পরে পরে যথা সময়ে সংযুক্ত করিলে সেই যন্ত্র যেরূপ পূর্ণাঙ্গ হয়, সেইরূপ মহান লক্ষ্যে বিরাট সেনা চালনারও ক্রম-পদ্ধতি আছে। এই বিরাট সেনা-যন্ত্রেরও প্রত্যেক অঙ্গটি সুচারুরূপে ও সমগ্র যন্ত্র-গতির সহিত এক যোগে কার্য্য করিলেই তবে সমস্ত ব্যাপারটি সুসিদ্ধ হয়, এবং এই সেনা-যন্ত্রে একটি সামান্য অঙ্গ বিকল হইলেই পরিণামের সুসিদ্ধি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

যুদ্ধার্থী কোন সমরের (war) আয়োজন করিবার সময়ে যেরূপ একটি ব্যাপক পূর্ব্ব-কল্পিত অভিসন্ধি (plan of campaign) ভাবিয়া রাখে এবং সমস্ত যুদ্ধভূমি ব্যাপিয়া তাহার লীলা করে, সেইরূপ একটি যুদ্ধ (battle) অভিনয়ের পূর্ব্বেও তাহার জন্য এক পূর্ব্ব-কল্পিত অভিসন্ধি থাকে; ইহার লীলা সমগ্র যুদ্ধভূমি না ব্যাপিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই (battle field) মাত্র আবদ্ধ থাকে। তন্মধ্যে সমর-ঘটিত এই বিরাটতর পূর্ব্ব-কল্পিত অভিসন্ধি এবং তাহার লীলাই ক্লজেউইট্‌জের আয়োজন-নীতির অন্তর্গত, অপরটি ক্ষেত্র-নীতির (tactics) অঙ্গীভূত। জাপানের গত কোরীয় ও মাঞ্চুরীয় সমর-পদ্ধতির আলোচনা করিলেই ক্লজেউইট্‌জের নীতি বিশদরূপে বুঝা যায়। সমর আরম্ভ করিবার পূর্ব্ব হইতেই জাপান স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, যে, সে কিরূপে মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়া রুষশূন্য করিবে। রুষের হস্তে সমুদ্রপথের একাধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকিলে দ্বীপবাসী

জাপানের পক্ষে যথেচ্ছা সেনা চালনা সম্ভব হয় না, কারণ মাঞ্চুরিয়া বা কোরিয়ায় জাপানের কোন বন্দরই নাই, বরঞ্চ রুষের আছে; সুতরাং রুষ-জাপান সমরে জাপানী পক্ষের পূর্ব্ব-কল্পিত অভিসন্ধির প্রথম অঙ্ক রুষ নৌশক্তি নাশ। তাই সমর ঘোষণা হইতে না হইতে আচম্বিতে জাপানী নৌ-সমরী টোগো পোর্ট আর্থার রণতরী-বহর (fleet) প্রায় নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। রুষ-নৌশক্তি ধ্বংস হইতে না হইতেই সে পূর্ব্ব-কল্পিত অভিসন্ধির দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইল, কিউরোকী সসৈন্যে কোরিয়ায় অবতরণ করতঃ রুষ-সৈন্য তাড়াইয়া কোরিয়া রুষ-হীন করিলেন, প্রায় বিনা রক্তপাতে বিনাযুদ্ধে রুষ-সেনা হটিতে হটিতে ইয়ালুর পর-পারে মাঞ্চুরিয়ায় যাইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর কিউরোকি, ওকু, নজু, নোগ ও কাওয়ামুরা এই পঞ্চ মহারথীর অনির্ব্বচনীয় রণলীলার আরম্ভ। একই শেষ লক্ষ্য দৃষ্টিপথে রাখিয়া সকলেই অগ্রসর হইতেছেন, পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য অনুসারে কেহ ইয়ালু উত্তীর্ণ হইয়া প্রধান রুষ-সেনার সহিত আপনাকে সংযুক্ত রাখিয়া চলিতেছেন, কেহ পোর্ট আর্থার বিচ্ছিন্ন করতঃ (isolating) দ্বিতীয় পথে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেছেন, কেহ পোর্ট আর্থার অবরোধ ও ধ্বংস করতঃ চরম লক্ষ্য মুকডেনের পথে যাইয়া যবনিকা (screen) পাতের অভিসন্ধিতে আছেন এবং কেহ বা নানা পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া রুষ-সেনার সমস্ত খণ্ড চেষ্টা ব্যর্থ করিতেছেন। এইরূপে মাঞ্চুরীয় সমরে জাপানী ক্লাজেউইটজের অপূর্ব্ব নীতি প্রতিপন্ন করিয়াছিল। এই বিরাট সমর আয়োজন ও

লীলা টোকিওর সামরিক মণ্ডলীর অঙ্গুলি সঙ্কেতেই সম্পন্ন হইতে-ছিল বটে, কিন্তু কোডামা প্রভৃতি রণপণ্ডিতগণ এক বিশাল ব্যাপক পূর্ব্ব-কল্পিত অভিসন্ধি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন, এবং কোন্ সেনা-পতি কোন্ পথে যাইয়া কি কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিলে এই অভিসন্ধির এক একটি অংশ পূর্ণাঙ্গ সুসিদ্ধ হইবে, তাহাই স্থির করিয়া দিয়া-ছিলেন। কিন্তু সেই সেই সেনাপতি কি উপায়ে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন, তাহা তাঁহাদেরই রণপাণ্ডিত্ব ও বুদ্ধি-চাতুর্য্যের উপর নির্ভর করিতেছিল। যুদ্ধ বা সমর উভয়ই এই উপায়ে চালাইলে প্রত্যেক সেনাপতি ও সেনানীর মৌলিক রণবুদ্ধিও কার্য্যে আসে, এবং রণপণ্ডিতমণ্ডলী নিয়ন্তারূপে থাকায় সমস্ত সমর-লীলার গতি ও পরিণতি একমুখী হয়।

এইরূপে যখন একটি সমর-ক্রীড়ার অন্তর্গত সকল যুদ্ধগুলিই এক লক্ষ্যরূপ সূত্রে গ্রথিত থাকে তখন তাহার বেগ অদমনীয় হইয়া উঠে। অস্ত্রে শস্ত্রে রণসম্ভারে ও সৈন্যসামন্তে পুষ্ট একটি সেনাকে পরাজিত করা আজ কাল বড় সহজ কথা নহে। এরূপ সেনা বহু খণ্ড যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও সহজে ক্লান্ত হয় না। কারণ রণে ক্ষয়িত অস্ত্রসম্পদ বা সৈন্যসম্পদ পূর্ণ করিবার অনেক উপায় আছে। দুই দশটি যুদ্ধে ভীষণ পরাজয় সত্ত্বেও যদি তাহারা নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসরমাত্র পায় এবং পশ্চাতের আপন সংযোজক রেখা অবিচ্ছিন্ন রাখিতে পারে, তাহা হইলে সে পুনঃ পুনঃ পরাভূত সেনাও বারম্বার মহাতেজে অক্ষুণ্ণ গর্ব্বে যুদ্ধ গ্রহণ করে। সুতরাং কোন ব্যাপক

অভিসন্ধি দৃষ্টিপথে না রাখিয়া কেবল মুহুর্মুহু বহু উদ্দেশ্যহীন যুদ্ধে পরাজিত করিয়াই শত্রুকে ক্লান্ত করা যায় না। কি সভ্য কি অসভ্য, যে কোন যুদ্ধমান সেনার জীবনীশক্তি (power of maintenance) আজ কাল বড় অধিক; "মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী," তেমনি যুদ্ধশীল সেনা মরিয়াও সহজে মরে না, বার বার মৃতকল্প হইয়াও নূতন উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। কিন্তু ব্যাপক অভিসন্ধি চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া একই পরিণাম সুসিদ্ধ করিবার জন্য যদি প্রতিপক্ষকে যুগপৎ বামে দক্ষিণে সম্মুখে পশ্চাতে প্রহারে জর্জ্জরিত করা যায় এবং যুদ্ধের পর যুদ্ধে পরাজিত করতঃ ক্রমশঃ পশ্চাদ্‌পদ করা যায়, তাহা হইলে সেই একমুখী আক্রমণপরম্পরা তাহাকে অতি শীঘ্রই নির্জীব করিয়া ফেলে। যতক্ষণ বিপক্ষ সেই পূর্ব্বকল্পিত অভিসন্ধি না ভেদ করিতে পারে ততক্ষণ আর তাহার পক্ষে সে দুর্দ্দমনীয় সেনার গতিবেগ ধারণ ও প্রতিহত করা সম্ভব হয় না। সমস্ত যুদ্ধভূমি ব্যাপিয়া মহতী সেনা যে রণলীলা করিতেছে তাহার অন্তর্নিহিত সেই অভিসন্ধি পূর্ব্বেই অনুধাবন করিতে হইবে এবং উপলব্ধি করিয়াই পরমুহূর্ত্তে প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ গতি-ক্রম (movements) রোধ করতঃ সেই অভিসন্ধি সাধনোপযোগী সকল ভাবী চেষ্টার প্রতিকার পূর্ব্বাহ্ন হইতেই করিয়া রাখিতে হইবে। প্রতিপক্ষ তাহা না করিলে আততায়ী নির্ব্বিঘ্নে নিজ গুপ্ত অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার অবসর পায়, প্রতি যুদ্ধ জয় করিবার অবসর পায়, প্রতি যুদ্ধ জয় করিবার পর সাহসে আত্মবিশ্বাসে সেনায় উপকরণে অধিকতর বলবান হইয়া উঠে, ক্রমে শত্রুকে পশ্চাদগামী করতঃ ক্রমে নানা অনুকূল কেন্দ্র করায়ত্ত করতঃ এবং ক্রমে যুদ্ধভূমির দিকে দিকে সুকৌশলে শত্রু ব্যূহ ভেদ ও বেষ্টন করতঃ নিজ

সিদ্ধির পথ সুগম করিয়া আনে এবং আপন সংযোজক রেখা নেপথ্য ভূমি, সেনা ও আয়ুধাগার প্রভৃতি উত্তরোত্তর নির্ব্বিঘ্ন করিয়া আনে।

ক্লজেইউটজের এই ব্যাপক পূর্ব্ব-কল্পিত অভিসন্ধির অনুযায়ী দীর্ঘ সমর-সজ্জের অবতারণা কতদূর সমীচীন তদ্বিষয়ে সুধীগণ আজও একমত হইতে পারেন নাই। তবে যে ক্ষেত্র বিশেষে ইহাই একমাত্র প্রযোজ্য নীতি তদ্বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। বিশাল সেনা যখন বহু অক্ষৌহিণীতে বিভক্ত হইয়া পরে অভিসন্ধির নানাসূত্র ধরিয়া একে একে পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে হইতে সিদ্ধি-সঙ্গমে যাইয়া চলে, তখন সে বহুভুজা আততায়ী সেনার গতি স্বভাবতই মন্দীভূত হইয়া আসে। তাহাতে আর "লঘুবেশ, লঘু অস্ত্র ক্ষিপ্রকারী" সেনাদলের স্বভাবত বিদ্যুৎগতি থাকে না। কারণ কোন ব্যাপক অভিসন্ধির সকল অঙ্কগুলির কার্য্যে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে প্রত্যেক অক্ষৌহিণীর সেনাপতিকে অপর অক্ষৌহিণীগুলির গতির ও সিদ্ধির মুখাপেক্ষী হইয়া চলিতে হয়, কেহই অত্যধিক অগ্রসর হইতে পারে না, বা কেহই বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেও চলে না। কোন সেনাপতিকে হয় ত শত্রুর পুরোভাগ আক্রমণ করিতে হইবে, সুতরাং অন্য সেনাপতি প্রচ্ছন্নবাহিনী লইয়া বিপক্ষের পশ্চাদ্দেশ আক্রমণ করতঃ যতক্ষণ না পুরোভাগের কতক সেনাকে পশ্চাৎ রক্ষায় ব্যস্ত হইতে বাধ্য করিতেছে, ততক্ষণ সম্মুখ আক্রমণ স্থগিত রাখাই আবশ্যক হয়। আবার কোন সেনাপতিকে হয়ত তাহার বাহিনী লইয়া কোন বন্দর ধ্বংস ও করায়ত্ত করিতে হইবে, কিন্তু যতক্ষণ নৌ-সেনাপতি সমুদ্রপথ নিঃশত্রু করিয়া জলপথে বন্দরমুখ রোধ করিয়া না দাঁড়াইতেছে, ততক্ষণ এই বন্দরের দিকে কৃতাভিযান সেনাকে যুদ্ধের ছলমাত্র করিয়া বন্দরের স্থলপথ সকল বেড়িয়া রাখিতে হয়, তাহারা অবি-

লম্বেই ভীম তেজে আক্রমণ করিতে পারে না। এইরূপে পরস্পরের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে আততায়ী চমূর গতিক্রম (movements) মৃদু হইয়া যায় এবং কোথায় এই বিরাট অভিসন্ধির একটি সূত্র হারাইলে সমস্ত পণ্ড হইবে ভয়ে সেনাপতিগণ অতি সাবধান হইয়া পড়ে। অতি সাবধানতায় অনেক সময়ে কার্য্যোদ্ধার হয় বটে, কিন্তু যে ক্ষেত্রে অমিত তেজ ও অপ্রতিহত গতিই কার্য্যকরী হইবে, সে ক্ষেত্রে ক্লজেউইটজের অতি সাবধানতা সে সকল গুণের স্ফূর্ত্তি হইতে দেয় না। সমরক্রিয়া কৌশল ও ক্ষেত্রনীতি উভয়ের অন্তর্গত যে কোন উপায়ই ক্ষেত্রবিশেষেই ব্যবহার হয়, কাল পাত্র ও অবস্থা নির্ব্বিচারে সকল ক্ষেত্রেই সমান ফলকর হয় না।

এইজন্য ক্লজেউট্জের অনুবর্ত্তীই হউক বা ইংরাজী রণনীতির অনুবর্ত্তীই হউক, যে কোন রণপটু যুযুৎসু (combatant) যুদ্ধভূমে নামিবার পূর্ব্বে তদুপযোগী দুই তিনটি পূর্ব্বকল্পিত অভিসন্ধি (wan of campaign) স্থির করিয়া তবে সমরে প্রবর্ত্তিত হয়। কারণ উভয় পক্ষের জয় পরাজয়ের গতি অনুসারে রণক্ষেত্র, যুদ্ধভূমি, নৈপথ্যকেন্দ্র প্রভৃতি সকলই ঘন ঘন পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; সুতরাং একস্থানে এক অবস্থায় যে অভিসন্ধি ফলদায়ী হয়, সে অবস্থা সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন মূর্ত্তিধারণ হয় ত সম্পূর্ণ বিপরীত অভিসন্ধি না হইলে জয়লাভ ঘটে না। অধিকন্তু যখন কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রনীতি ও অভিসন্ধির অনুযায়ী সেনা চালনা

হইতেছে তখন সেই ব্যাপক বিরাট অভিসন্ধির কোন একটি বিশেষ সূত্র ব্যর্থ হইয়া এরূপ অবস্থা আসিয়া পড়ে যে সেই অঙ্গ-বিশেষ বিকল হওয়ায় সমস্ত অভিসন্ধি ও ক্ষেত্রনীতিই ব্যর্থ হইয়া যায়। তখন কোন পূর্ব্বকল্পিত দ্বিতীয় বা তৃতীয় অভিসন্ধি স্থির করা থাকিলে তাহার প্রয়োগ করা যাইতে পারে, উপায়াভাবে অনর্থক বিমূঢ় হইয়া পড়িতে হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

আততায়ীর সমর-ক্রিয়া-কৌশল উদ্যোগভাগ।

কোন যুদ্ধেতিহাস লেখক লিখিয়াছেন,—"Strategy or the art of generalship is practised some times long before contact with the enemy has been established. In the presence of the enemy, on the other hand, the lrnsiness of using troops is called tactics." উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী সেনা যতক্ষণ অবধি পরস্পরের সহিত সম্মুখীন হইয়া সংঘর্ষের আরম্ভ না করিয়াছে ততক্ষণ একপক্ষ অপরের বল, বিশ্বাস, উপকরণ ও সুবিধা হরণ করিবার জন্য যাহা কিছু করে তাহাই ক্ষেত্রনীতি বা আয়োজন-নীতি নামে অভিহিত হয়। কিন্তু সংঘর্ষের সূচনা হইবার পর যে যে উপায়ে আক্রমণ, সম্প্রসারণ (frontal extension and throwing out of uings and fulers). ব্যূহভেদ, শত্রুব্যূহে চঞ্চুপ্রবেশ (to drive a wedge into the enemys lines), গুপ্তাক্রমণের (amlnscaees) কূটকৌশল, বেষ্টন, আত্মরক্ষা ও পশ্চাদ্গমন (retreat) প্রভৃতি সম্পন্ন ও সুসিদ্ধ হয় তাহারই নাম সমর-ক্রিয়াকৌশল। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে ক্ষেত্রনীতি ও সমর-ক্রিয়াকৌশলের ইহাই প্রকৃত সংজ্ঞা বা প্রভেদ। কিন্তু অনেক সময়ে রণপদ্ধতির এই দুই অংশকে পরস্পর হইতে বিমুক্ত করিয়া লওয়া বড় কঠিন হইয়া পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধকালে যখন একটু সময়ে, যুগপৎ উভয়ের ব্যবহার হয়, তখন

একটি বিশেষ ক্ষেত্রনীতি কোথায় যাইয়া সমরক্রিয়াকৌশলে পরিণত হইল তাহা সহজে উপলব্ধি হয় না। তবে প্রথমোক্তটির উদ্দেশ্য প্রায় বিনা রক্তপাতে প্রতিপক্ষের বলহরণ এবং দ্বিতীয়টির লক্ষ্য সংঘর্ষের ফলে অস্ত্রপ্রয়োগে ও বাহুবলের নিয়োগে শত্রুর যথাসম্ভব নাশ সংঘটন। এই ভেদটুকু বুঝিলেই উভয়ের স্বরূপ অনেকাংশে উপলব্ধি হয়।

সমরাঙ্গনে দাঁড়াইয়া যে দুই পক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, তাহাদের একপক্ষ স্বভাবতই আততায়ী বা আক্রমণোচ্ছু (on the offensive) কর্ত্তব্য গ্রহণ করে এবং অপরটি আত্মরক্ষীর ভাবে (on the deffensive) মল্লভূমে অবতীর্ণ হয়। যাহার শক্তি সামর্থ্য উপকরণ ও অবসর অধিক, বা যে সেনা পররাষ্ট্রে আসিয়া রাজ্য-লাভাশায় বা যে কোন উদ্দেশ্যে অভিযান (expedition) আরম্ভ করে, সেই সাধারণতঃ আততায়ী নামে পরিচিত এবং যে দুর্ব্বল পক্ষ আক্রান্ত উৎপীড়িত বা বিদ্রোহী হয় সেই আত্মরক্ষীরূপে অস্ত্র-ধারণ করে। দুই তিন বর্ষ ব্যাপী একটি দীর্ঘ সমরে একই পক্ষ সকল সময়ে প্রথম হইতে শেষ অবধি আততায়ী থাকে না, যুদ্ধে বিপক্ষের শৌর্য্যে রণপটুতায় পরাজিত ক্ষয়িতবল হইলেই আত্মরক্ষী বিপক্ষ তখন আততায়ীর রুদ্র উদ্যত মুশলমূর্ত্তি ধারণ করে, এবং পূর্ব্বপক্ষ প্রাণপণে আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। রুষ-জাপান সমরে প্রথম হইতে শেষ অবধি রুষই জয়োন্মত্ত দুর্জ্জয় জাপানীর প্রহার হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছিল, দুই একটি খণ্ডযুদ্ধে ক্ষণিক আক্রমণ ব্যতীত কখনই আততায়ীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবার অবসর পায় নাই। বুয়ার সমরের অব্যবস্থিত যোদ্ধা (guerrila fighter) বুয়ার প্রথমে আততায়ীরূপে ইংরেজাধিকৃত

নাটাল আক্রমণ করতঃ স্থানে স্থানে কয়েকটি ইংরাজবাহিনীকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু যখন তিন মাস পর সেনাপতি লর্ড রবার্টস্ পরাজিত ইংরাজপক্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন তখন হইতে সমরের শেষাঙ্ক পর্য্যন্ত মুষ্টিমেয় বুয়র শক্তিকে আত্মরক্ষায়ই তৎপর থাকিতে হইয়াছিল। ফ্রাঙ্কো জার্ম্মাণ সমরেও প্রথমে জার্ম্মাণী আততায়ী, কিন্তু শেষে পরাজিত লাঞ্ছিত ফরাসীই দুর্জ্জয়-বেগে জার্ম্মাণীকে পদদলিত করিতে করিতে পশ্চাদ্পদ করিয়া দেয়। এইরূপে চঞ্চলা রণলক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ যখন যাহার শিরে বর্ষিত হয়, তখন সেই বিপক্ষকে শস্ত্রপ্রহারে প্রপীড়িত করিতে থাকে। এমন কি প্রায় সমগ্র সমরে (war) আততায়ীর বলে শত্রু দলিয়াও পরিণামে একটিমাত্র যুদ্ধে সে বিশ্ববিজয়ী বাহিনীকে আত্মরক্ষাপরায়ণ হইতে দেখা গিয়াছে।

দুইটি বিভিন্ন শক্তি রণোন্মুখ হইয়া সমরঘোষণা করিবামাত্র কালবিলম্ব না করিয়া যুদ্ধভূমে সৈন্য প্রেরণ আরম্ভ করে। প্রতি-দ্বন্দী শক্তিদ্বয়ের রাজ্য পরস্পরের নিকটে থাকিলে তাহাদিগের মধ্যে যে পক্ষ কর্ম্মঠ দ্রুতগামী ও পূর্ব্ব হইতেই অভিযান করিবার জন্য সম্যক প্রস্তুত, সেই পক্ষই বিপক্ষের রাজ্যে ভীমগতিতে আপতিত হইয়া তথায় যুদ্ধভূমি নির্ম্মাণ করিয়া ফেলে। উভয় প্রতিদ্বন্দী রাজ্য পরস্পর হইতে অতি দূরবর্ত্তী হইলেও আজকাল এই রেল ও জাহাজের দিনে ইহা অসম্ভব হয় না; মহাবীর ইউরোপজয়ী নেপোলিয়ঁ সুদূর মিশরে যাইয়াও যুদ্ধঘোষণা করিয়া-ছিলেন, ব্রিটিশ সেনা মাহদীর রাজ্যে গিয়া ব্যূহ রচিয়া তাঁহার পদে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়াছিল। যে ক্ষেত্রে যুযুৎসু সেনাদ্বয়ের মধ্যে উভয়ের কাহারও করায়ত্ত নহে এরূপ এক তৃতীয় রাজ্য লইয়া

সংগ্রাম আরম্ভ হয়, তথায়ও যে শক্তি পূর্ব্বে যাইয়া প্রচুর সৈন্য ও রণসম্ভার যুদ্ধভূমে সঞ্চিত করিয়া অচিরাৎ নিখিল যুদ্ধভূমি ব্যাপিয়া সেনা চালনা (mobilisation) করে, অনুকূল রণক্ষেত্র যুদ্ধভূমি ও সন্নিবেশ কেন্দ্রাদি তাহারই করায়ত্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যুদ্ধঘোষণার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কার্য্যই সেনাপ্রেরণ ও চালনা। সঞ্চিত সেনা, অস্ত্র, চর ও রসদ প্রভৃতি বিদ্যুদগতিতে চালনা করিয়া যুদ্ধভূমির যত অধিক সম্ভব অনুকূল ক্ষেত্র করায়ত্ত করিয়া ফেলিতে হইবে, এবং ভাবী সমরের লীলাভিনয়ের জন্য যে পূর্ব্বকল্পিত অভিসন্ধি স্থির হইয়াছে তদনুযায়ী দিকে দিকে বিভিন্ন পূর্ণাঙ্গবাহিনী লইয়া অভিযান করিতে হইবে। উদ্যোগপর্ব্বের এই অবস্থায় সমগ্র যুদ্ধভূমি ও তাহার চতুস্পার্শস্থ স্থান ব্যাপিয়া চর-নিয়োগ করা আবশ্যক ; কারণ যুদ্ধঘোষণার বহুপূর্ব্বে ভাবী যুদ্ধভূমি সম্বন্ধে যতটুকু তথ্য সংগৃহীত থাকে, তাহা অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব-কল্পিত অভিসন্ধি রচিত হইতে পারে বটে, কিন্তু শত্রু কোথায় কি ভাবে সেনা-সন্নিবেশ বা চালনা করিতেছে তাহা না জানিতে পারিলে তদবস্থায় প্রয়োজ্য আয়োজননীতি ও সমরক্রিয়াকৌশলের (strategy and tactics) কল্পনা ও নির্দ্দেশ পূর্ব্ব হইতে করা যায় না। অভিসন্ধির কল্পনা সার্থক হয় কেবল তখনি যখন রণপটু কূটকৌশলী সেনাপতি বিপক্ষের বলবিন্যাস দর্শন ও বলনিয়োগ নীতি উপলব্ধি করতঃ তাহার প্রতিবিধানপূর্ব্বক সেই অভিসন্ধি বর্ণাভিনয়ে পরিস্ফুট করিয়া তোলে। এই কার্য্য চতুর সমরক্রিয়া-কৌশলেরই সাপেক্ষ্য।

একস্থান হইতে স্থানান্তরে সৈন্যচালনা কালে একটি বাহিনী (army) বা খণ্ডবাহিনী এরূপ ভাবে বিবিধ অঙ্গের বিন্যাস করিয়া

সচল ব্যূহের রচনা করে, যাহাতে কোনপ্রকার অতর্কিত আক্রমণে বা সংঘর্ষেই সেনা বিশৃঙ্খল হইয়া না পড়ে। বাহিনী যখন কোন বিশেষ স্থানে ছাউনী করিয়া থাকে তখন সর্ব্বপ্রথমে এক একশত হস্ত ব্যবধানে এক একজন অশ্বারোহী সান্ত্রী (vedettes) প্রহরায় নিযুক্ত হয়। বাহিনীর চতুর্দ্দিকে পাঁচ দশ ক্রোশ ব্যাপী অতি ক্ষীণ বৃত্তাকারে সন্নিবিষ্ট এই অশ্বসাদী সান্ত্রীদলই বিশ্রামকারী সন্নিবিষ্ট-শিবির প্রথম প্রাচীর বা ব্যূহের বহিস্তম প্রান্ত। অশ্বারোহী রেখার পশ্চাতে তেমনি বৃত্তাকারে পদাতিক রক্ষীদল থাকে, ইহাদিগকে বহিস্থ বা শিরস্থ সেনা (out post) বলে। ইহাদিগের অবস্থান পদ্ধতি বৃত্তাকার, কিন্তু সেই বৃত্ত মণ্ডলত্রয়যুক্ত। প্রথম মণ্ডলে অতিমাত্র তরল রেখায় রক্ষিগণ (sentries) বিচরণ করে; দ্বিতীয় মণ্ডলে অপর এক রেখা সৈন্য গুচ্ছে বদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে সন্নিবিষ্ট রহে এবং তৎপশ্চাতে অপেক্ষাকৃত ঘনভাবে ইহাদিগের সাহায্যার্থ এক সমর্থক বা পৃষ্ঠপোষক সৈন্যদল থাকে। এই ত্রিমণ্ডলচারী পদাতিক শাস্ত্রী সূক্ষ্ম জালের ন্যায় ব্যাপ্ত রহিয়া ব্যূহবদ্ধ সেনার দ্বিতীয় বৃত্ত গঠন করে। তৃতীয় বৃত্তের নাম নাসীর পরে (advanced guards) বা পুরোচারী যোদ্ধৃসেনা। শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ ঘটিলে অশ্বসাদী ও পদাতিক শাস্ত্রী পরম্পরায় সেনা-সংবাদ পাইয়া তাহাদিগের সাহায্যে প্রকৃত পক্ষে ইহারাই সংঘর্ষের প্রথম বেগধারণ ও রোধ করে। এই বৃত্তত্রয় বেষ্টনের আশ্রয়ে সেনা বাহিনীর অশ্বসাদী পদাতিক তোপ-বহর আয়ুধাগার ভাণ্ডাগার ও সন্নিবেশ কেন্দ্রাদি নির্ব্বিঘ্নে যথাস্থানে যতদূর সম্ভব রণবেশেই বিশ্রাম করিতে পারে, কারণ শত্রু এই বহুবৃত্তসমন্বিত রক্ষীসেনা বলপ্রয়োগে

সঙ্কুচিত অথবা ভেদ না করিলে তাহাদিগের অন্তস্থ বলকে স্পর্শও করিতে পারে না।

ছাউনী উঠাইয়া আবার কুচ করিবার সময় হইলে বৃত্তত্রয় মধ্যস্থ সেনার নায়ক নাসীরপতিকে (commander of the advance guards) অগ্রসর হইবার আদেশ প্রেরণ করেন; নাসীরপতি আবার সেই আজ্ঞা গুল্ম সেনাপতিকে (cmnmander of the out posts) অবগত করান। তখন তাঁহার আদেশে সেই বহুক্রোশ ব্যাপী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রক্ষিগুলি একে একে অদৃশ্য হইতে থাকে, রক্ষিগণ দ্বিতীয় মণ্ডলস্থ সেনাগুচ্ছ-গুলির সহিত এবং সেই সেনাগুচ্ছগুলি (pickets) ক্রমে তৃতীয় মণ্ডলীগত পৃষ্ঠপোষক মৌল সেনার সহিত মিলিত হইয়া এক অপেক্ষাকৃত ঘনবদ্ধ প্রাচীরে পরিণত হয়। এই ঘনসম্বদ্ধ সেনাদল তখন যুদ্ধোপযোগী হইয়া সেই অভিযান ব্যূহের নাসীর চররূপে অগ্রসর হইতে থাকে। সচল অথচ সদা রণোন্মুখ সেনার বিন্যাস পদ্ধতি (marching order) সচরাচর এইরূপ হয়,—১। পুরো-চারী অশ্বসাদী দল। ২। নাসীর চর রেখা। ৩। কামান বহর, ৪। মৌল সেনা (main army) বাহিনী। ৫। পার্ষ্ণিগ্রাহ (reserve) এবং ৬। পার্ষ্ণিত্র সেনাদল (rear guard)। এই গতিশীল বাহিনী-ব্যূহের কেন্দ্রে অথবা কখন কখন বিশেষ রক্ষীদলে বেষ্টিত হইয়া পশ্চাতে আয়ুধাগার ও ভাণ্ডাগার চলে, এবং সেনার চতুর্দ্দিকে প্রচ্ছন্ন বিক্ষিপ্তভাবে থাকিয়া চরগণ তথ্য সংগ্রহ করে। সেনা চালনার ইহাই মূল নিয়ম; অবশ্য অবস্থা ও ক্ষেত্রভেদে ইহার কতক পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু তাহা সেনানীর সন্নিবেশ নিপুণতা ও দূরদর্শিতার উপর নির্ভর করে।

যুদ্ধের পর যুদ্ধে জয়শ্রী অঙ্কশায়িনী করিলেও যে শত্রুকে সহজে নির্জীব করা যায় না তাহা ক্ষেত্রনীতি শীর্ষক পরিচ্ছেদে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ণাঙ্গ ও উপযোগী ক্ষেত্র-নীতির নিয়োগ, সেনা চালনার কৌশল, নানা যুদ্ধে বিজয়লাভ এবং শত্রুসংখ্যা হ্রাস এই সকল গুলির সমবায়ের ফলেই কেবল শত্রুকে পরিণামে পরাজিত করা যায়। জিষ্ণু বিপক্ষ কতক পরিমাণ শক্তি উপকরণ ও রণবুদ্ধি লইয়া যুদ্ধাঙ্গনে অবতরণ করে; সেই বল প্রায় নিঃশেষে ক্ষয় এবং পুনর্ব্বল সঞ্চয়ের পথরোধ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিপক্ষ রণবিরত হয় না। একটি বা দুইটি মাত্র উপায়ে সে ক্রম বৃদ্ধিশীল ও সুরক্ষিত বলের নাশ করা অসম্ভব, সে নানা মূলপুষ্ট শক্তির উচ্ছেদের জন্য একাধিক উপায়ের প্রয়োগ করিতে হয়। সমরক্ষেত্রে অতি ভীষণরূপে বহু সৈন্য নষ্ট হইলেও আবার অমর জীবনীশক্তির (power of maintainance) প্রসাদে প্রায় অক্ষুণ্ণ বল শত্রু সে চেষ্টা উপহাস করিতে পারে। "Heavy casualty is no criterion of defeat," সুতরাং যুদ্ধের পূর্ব্বে সেনা পরিচালনা কৌশলে এবং প্রারম্ভিক সংঘর্ষের (preliminary operations & skermishes) দ্বারা শত্রুকে এরূপ ভাবে নিপীড়ন করিতে হয় যাহাতে প্রকৃত যুদ্ধের সময়ে সে তাহার সমবেত বল নিয়োগ করিতে না পারে। অনেক সময়ে সেনাপতির সৈন্য চালনা চাতুর্য্য ও ব্যাপ্তির ফলে শত্রু এতই অবসন্ন, ভীত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে যে এই ক্ষুদ্র সংঘর্ষ পরম্পরার চরম পরিণতিরূপ প্রকৃত যুদ্ধাভিনয় বা শত্রু কেন্দ্র অধিকার কার্য্য প্রায় বিনা রক্তপাতে যেন স্বতঃই নিষ্পন্ন হইয়া যায়। "In many warlike cases the prelimi

nary operations leading up to some important results are themselves so comprehensive, so thorough, and so detrimental to enemy's capacity for further resistance, that at the last the "action of the pieces" seems to crumble away, and there is nothing left but a little shouting" বিপক্ষের ধ্বংস উদ্দেশ্যে যুদ্ধভূমে আসিয়া সেনা কোন অভিসন্ধির সাধনার্থে পূর্ব্বোক্ত ব্যূহাকারে শত্রু শক্তির বিরুদ্ধে অভিযান করে; দিবা রাত্র যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে চলিয়া প্রতিপক্ষ সেনার সম্মুখীন হইলেই প্রথম কর্ত্তব্য তাহাকে চক্ষে চক্ষে রাখিয়া (establishing contact) রণাভিনয়ের জন্য উদ্যোগ করা। উভয় সেনা যখন এইরূপে সম্মুখীন রহিয়া পরস্পরের ধ্বংসের জন্য ছিদ্রান্বেষণ করে এবং যুদ্ধার্থে পূর্ব্বকল্পিত অভিসন্ধি অনুসারে সেনা সন্নিবেশ করিতে থাকে, তখনই ক্ষেত্রনীতি ও সেনা চালনা কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়। এই উদ্যোগ পর্ব্বের যে ক্ষুদ্র বৃহৎ সংঘর্ষের সৈন্যসজ্জা, সৈন্যক্ষেপ ও প্রত্যাহরণের দ্বারা যুদ্ধের সন্ধিক্ষণ নিকটতর করিয়া আনে তাহাই অনেক সময়ে এইরূপ বিরাট শত্রুবলনাশী ব্যাপারে পরিণত হয়, যে অবশেষে বিনা যুদ্ধেই বিপক্ষকে হয়ত রণক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ণপর হইতে হয়। জাপানীরা সমরের প্রারম্ভেই এরূপভাবে বিভিন্ন সেনাধারার প্রবাহবেগে রুষসেনাকে ভীত ও বিপন্ন করিয়াছিল যে, তাহারা আঁক্ষেত্রে সামান্য একটি দাঙ্গা মাত্র করিয়াই কোরিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। ইংরাজ সেনাপতি লর্ড রবার্টস্ এরূপ অপ্রতিহত দুর্ব্বার তেজে সেনাচালনা ও তাঁহার গতিরোধপ্রয়াসী বুয়ারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিলেন যে, বিনা যুদ্ধে

তাহারা লেডিস্মিথের অবরোধ উত্থাপন করতঃ পশ্চাদপদ হইল।

এই প্রকার রণক্রীয়া-কৌশল সকল করিতে হইলে বিদ্যুদ্-গতিসম্পন্ন অতিশয় কর্ম্মঠ যোদ্ধদল আবশ্যক। "motion and activity develop in war to a source of strength" "সেনার পক্ষে গতিবেগ ও কর্ম্মনৈপুণ্য তাহার অনন্ত বলের এক উৎস বিশেষ। কি ক্ষেত্রনীতি কি রণক্রীয়া-কৌশল উভয়ই গোপন রাখিয়া শুভক্ষণ বুঝিয়া নিয়োগ করিতে হইলে অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত কাজ করিতে হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে সমরক্রীয়া-কৌশল অত্যল্পও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেই রণবিশারদ প্রতিপক্ষ তাহা উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রতিকার করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং রণকৌশলের প্রয়োগ আরম্ভ করিলেই তৎক্ষণাৎ ত্বরিতবেগে তাহার বিকাশ করিতে হইবে, নতুবা অতর্কিত আক্রমণে শত্রুর অসাবধানতার অবসর লওয়া ঘটে না। এক-পক্ষের যুদ্ধমান সেনা স্বেচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক অপর পক্ষের সেনার সহিত যখনই সংস্পর্শে আসে, তখন প্রকৃত মৌল সেনাকে কেন্দ্রাভ্যন্তরে রাখিয়া উভয় দলের নাসীর চর ও শিরস্থ সৈন্য তরল রেখায় স্ব স্ব সেনার চতুস্পার্শে এক যবনিকার সৃষ্টি করিয়া দাঁড়ায়। এই সৈন্য যবনিকার অন্তরালে প্রতিপক্ষের অজ্ঞাতে মৌল সেনা (main army) পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সমরক্রীয়া-কৌশলের আয়োজন ও ক্রমবিকাশ (development) আরম্ভ করে। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপে পরস্পরের সম্মুখীন রহিয়া ছিদ্রান্বেষণতৎপর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে এক পক্ষকাল অবধি শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিতে দেখা গিয়াছে। শত্রু-পক্ষের ছিদ্র বা দুর্ব্বলতা বুঝিতে হইলে গুপ্ত সেনা ও নাসীর

চর দ্বারা তাহার কত সৈন্য কত অস্ত্র ও কি অভিসন্ধি আছে তাহার তথ্য লইতে হয়। সতর্ক যুদ্ধোন্মুখ প্রতিপক্ষের তথ্য লইবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদল তাহার বামে দক্ষিণে সম্মুখে মুহুর্মুহু নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে আত্মবল প্রকাশে বাধ্য করিতে হয়। হয়ত রণক্ষেত্রের এক স্থানে একদল অশ্বারোহী একটি স্তূপের আশ্রয়ে গোপনে শত্রুরেখার সন্নিহিত হইয়া অশ্বাবতরণ করিল এবং সহসা আত্মপ্রকাশ করতঃ বিস্মিত শত্রুর প্রতি ক্ষিপ্রহস্তে গুলি বর্ষণ করিয়া আবার সলম্ফে অশ্বারোহণ করিয়া অন্তর্হিত হইল। এই অতর্কিত আক্রমণের বেগ দর্শনে প্রতারিত উদ্বিগ্ন প্রতিপক্ষ হয়ত আততায়ী অশ্বারোহী দলকে সংখ্যায় বহু ভাবিয়া আপন ব্যূহের বহু কেন্দ্র (positions) হইতে অগ্নিধারা ও নানা গুপ্ত তোপবুরুজ হইতে শেল বর্ষণ করতঃ তাহাদিগের গতিরোধ করিল। ইত্যবসরে অশ্বারোহীদল বিপক্ষের সেই স্থানের সেনাবল ও তোপ সংখ্যার কতক সন্ধান বুঝিয়া ফেলিল, যে শেল বা গোলা আসিয়া পড়িতেছে তাহার খণ্ড উঠাইয়া দেখিয়া কোথায় কি প্রকার কামান আছে তাহা স্থির করিয়া লইল। আবার যুদ্ধাঙ্গনের অংশান্তরে হয়ত কোন শিরস্থ সেনাদল (out post) শত্রুব্যূহ ভেদ করিবার প্রয়াসে সংগোপনে অগ্রসর হইতে হইতে দেখিল একদল বিপক্ষ অশ্বারোহী নিঃশঙ্ক মনে একটি শিলা বা ক্ষুদ্র গিরির অন্তরাল হইতে বাহির হইতেছে। অমনি ভূমে নিঃশব্দে শয়ন করিয়া সৈন্যদল অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং সেই অশ্বসাদীগণ নিকটে আসিবা মাত্র প্রচণ্ড গুলিক্ষেপে তাহাদিগকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল; সেই বিপন্ন সৈন্যের রক্ষার জন্য তখন প্রতিপক্ষকে দিকবিদিক

হইতে আত্মপ্রকাশে এই দুঃসাহসী ভূশায়িত চরদলকে বিতাড়িত করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আক্রমণে শত্রুরেখার পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিবৃত তথ্য সংগ্রহ করা যায় না; তজ্জন্য ইহার অপেক্ষা বৃহত্তর আয়োজন করিতে হয়। নিজ যুদ্ধরেখার কোন এক অংশে আত্মবল গোপন করিয়া বিরাট আক্রমণের ভাব দেখাইয়া অগ্রসর হইতে হয়, এবং দুই তিন সহস্র সৈন্য ও কতকগুলি কামান সঙ্গে শত্রুরেখায় আপতিত হইতে হয়। আক্রমণের আড়ম্বর ও ঘনঘটা দেখিয়া বিপক্ষ ইহাই প্রতিপক্ষীয় শক্তির চরম প্রকাশ ভাবিয়া তাহার যথাশক্তি প্রতিকার মানসে দিকে দিকে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। এইরূপে শত্রুর প্রতারণা ও আত্মবিস্মৃতি সম্পূর্ণ হইলে যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহ করিয়া আত্মবল সাবধানে সংহরণ করতঃ পশ্চাদপদ হইতে হয়, এবং কিংকর্ত্তব্যমূঢ় শত্রুর যে কোন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্যূহাংশে প্রকৃত আক্রমণ লীলা আরম্ভ করিতে হয়। সবল সতর্ক শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ ও তথ্য অবগত হইবার ইহাই পদ্ধতি।

———:*:———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।
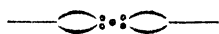
বর্ত্তমান যুদ্ধের স্বরূপ—অগ্নিক্রীড়া।

মধ্য যুগের সমর আর আজকালের আগ্নেয়াস্ত্রধারী সেনার সমরে অনেক প্রভেদ। পাঠক পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদ গুলিতে এই পার্থক্যের কতক পরিচয় পাইয়াছেন। নূতন রণাস্ত্রের ব্যবহার ফলে বর্ত্তমান সমরে ও তদন্তর্গত যুদ্ধে (১) যুদ্ধভূমি এবং রণাঙ্গনের দৈর্ঘ্য ও প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছে, (২) সেনা সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে, যুদ্ধ বা সমরের স্থায়ীত্বকাল বৃদ্ধি হইয়াছে, (৩) যুদ্ধ ফল বা পরিণাম অনিশ্চিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং (৪) লোক ক্ষয় অতি ভীষণরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমান সমরের অঙ্গনভূমি একটি দেশ বা মহাদেশ ব্যাপিয়া রচিত হয়, ইহার প্রতি যুদ্ধের ক্ষেত্রটি পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে প্রায় বিশক্রোশ এবং প্রস্থে প্রায় দুই তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়; বর্ত্তমান সমরের আয়ুষ্কাল দুই তিন বর্ষ ব্যাপী, একটি যুদ্ধের স্থায়ীত্ব পক্ষকালেরও অধিক। নব যুগের এই বহুকুরুক্ষেত্রসমন্বিত সমরে এবং এমন কি একটি মাত্র যুদ্ধেও সময়ে সময়ে উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী সেনার সংখ্যা সাত আট লক্ষে পরিণত হয়। এত বিশাল সমরসত্রে মহাবীর্য্য অস্ত্র লইয়া এত লোকের সংঘর্ষ হইলে তাহার ফলে দুই তিন লক্ষ সেনা হতাহত হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? এই সেনা ক্ষয় নিবারণ ক্ষেত্রনীতিজ্ঞ ও সমরক্রীড়াকৌশলী দক্ষ নিয়ন্তারূপী

সেনাপতির রণচাতুর্য্যের উপর নির্ভর করে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে ক্ষেত্রনীতির যতটুকু দেখান সম্ভব তাহা হইয়াছে; এখন দেখা যাক সময় ক্রীড়া কৌশলের কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বনে এই অতিমাত্র লোকক্ষয় নিবারিত হইতে পারে। সেরূপ উপায়ের মধ্যে এই গুলিই প্রধান, যথা, ১ম। দূর হইতে যুদ্ধারম্ভ, ২য়। তরল রেখায় আক্রমণ, ৩য়। আশ্রয়ের ব্যবহার ও ক্ষেত্র প্রণয়ণ, ৪র্থ। সংবেষ্টন, ৫ম। অশ্বসাদীর সহায়তা, এবং ৬ষ্ঠ। নিরস্তার চালনা শক্তি।

এই বৈজ্ঞানিক কালের ক্ষেপকাস্ত্র অতিশয় দূর ভেদী হইয়াছে বলিয়া উভয় সেনাকে পরস্পর হইতে দুই দশ ক্রোশ অন্তরে থাকিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হয়। এত দূরে থাকিয়া অবশ্য রাইফেল-যুদ্ধ চলে না, সুতরাং যুদ্ধাঙ্গনের নানা কেন্দ্রে (position) স্থাপিত কামানরাজি লইয়া প্রথমে উভয় পক্ষে অগ্নি ক্রীড়া (artillery duel) চলে। এই অগ্নি দ্বন্দ্বের ফলে যতক্ষণ না একপক্ষের গোলন্দাজগণ নিস্তেজ হইতেছে, যতক্ষণ একপক্ষের অধিকাংশ কামান লোকাভাবে, গোলার অভাবে বা শত্রুর অগ্নিবাতের দুর্জ্জয় প্রহারে নীরব না হইতেছে, ততক্ষণ রাইফেল-ধারী সেনা অগ্রসর হইতে পারে না, স্ব স্ব ব্যূহে লুপ্ত থাকিয়া শুভ মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করে। দুই দলের মধ্যে এক বা দুই ক্রোশের যে ব্যবধান থাকে, যাহা অতিক্রম করিতে গেলেই প্রতিপক্ষের তোপ ও রাইফেল শ্রেণীর অগ্নিবাতে ছাইয়া যায়, সেই স্থানকে অগ্নিভূমি (zone of fire) বলে। এই অগ্নিভূমির মারাত্মক তেজ হ্রাস করিতে হইলে শত্রুর কতক কামানকে অকর্ম্মণ্য (put out of action) করিয়া ফেলিতে হয়।

কতকগুলি কামান ভগ্ন বা গোলান্দাজহীন করিয়া অবশিষ্ট গুলিকে দ্বন্দ্বে নিযুক্ত রাখিতে পারিলেই এই অগ্নিভূমি আচ্ছন্ন রাখিবার জন্য আর উদ্বৃত্ত কামান থাকে না, শত্রুকে রাইফেল মাত্র ভরসা করিয়া আততায়ীর গতিরোধ করিতে হয়।

যে সেনানী এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত নহে বা স্বেচ্ছায় ইহা অবহেলা করে, বর্ত্তমান রণনীতির সার গ্রহণে সে সমর্থ হয় নাই বলিতে হইবে। ইংরাজ সেনানীগণ বুয়ার যুদ্ধের পূর্ব্ব অবধি যুদ্ধারম্ভে অগ্নি ক্রীড়ার উপযোগীতা বুঝিতেন না, আজও তাঁহারা ইহা সম্পূর্ণ স্বীকার করেন নাই। ভারতে বা সীমান্ত দেশে, মিসরে বা আফ্রিকায় রণানভিজ্ঞ জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত ইংরাজ যোদ্ধা পদাতিক বা অশ্বারোহী সংঘর্ষের (Shock tactics) উপকারিতাই অধিক মনে করেন। ক্রঞ্জিকে সংবেষ্টন করিবার পর লর্ড কিচেনার কামান প্রয়োগে বুয়ারকে হতবল না করিয়াই সসৈন্যে আক্রমণ করেন, তাহার ফল যে কিরূপ বিষময় হইয়াছিল তাহা জার্ম্মান সমর বিভাগের নিম্নোদ্ধৃত মত পাঠ করিলেই উপলব্ধি হয়। "But Kitchener's attempt to drive the enemy from his position by shock and not by fire tactics showed that he, like most British officers, did not appreciate correctly the essence of the modern infantry fight. It was too early to charge, and that the essential thing to be done was to strengthen the fire and enfilade."

এই অগ্নি ক্রীড়ার গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, কামানের সমর-ক্রীড়া-কৌশল (*fire* tactics) বুঝা আবশ্যক।

প্রথম অবস্থায় প্রাচীন কালে কামানের যে ব্যবহার ছিল আজ এত উন্নতির দিনেও তাহাই আছে,—অর্থাৎ অস্ত্রধারীর ন্যায় কামানও সেনার অন্য অস্ত্রের সহায় মাত্র (Support of other arms). পদাতিকের ন্যায় ইহা যুদ্ধের প্রধান উপকরণ নহে।

একবার লক্ষ্য স্থির হইয়া গেলে অর্থাৎ শত্রু যে স্থানে লুকাইত আছে, তাহা অতিক্রম করিয়া একটি শেল এবং তাহার ঈষৎ সম্মুখে একটি শেল ফেলিয়া যখন গোলন্দাজ ঠিক বুঝিয়া লয় যে ৩০০০ গজ হইতে ৩৪০০ গজের মধ্যে শত্রু আছে, তখন ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, এমনি করিয়া প্রত্যেক এক গজ ব্যবধানে দুইটি করিয়া অগ্নি ধারা (round) বর্ষণ করে,এইরূপে গুপ্ত খাতের শত্রু অগ্নিপ্রহারে খাত ও কামান ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। আত্মগোপন না করিতে পারিলে কামান কার্য্যকরী হয় না। যে স্থানে কোন প্রাকৃতিক আবরণ নাই তথায় কৃত্রিম তোপ বুরুজই কামানের আশ্রয়।

যদি স্বপক্ষের গোলা তোপ বুরুজের সম্মুখের স্তূপ অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে, তাহা হইলে শত্রুপক্ষের গোলা সহজেই তাহা অতিক্রম করিয়া আসিয়া তোপ নষ্ট করিতে পারে; কারণ শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া দাগিতে স্বপক্ষের গোলা যত উচ্চে উঠে, গোলান্দাজ লক্ষ্যে শত্রুপক্ষের গোলা তদপেক্ষা অধিক উচ্চে উঠিয়া পড়ে। গত যুদ্ধে রুস ও জাপান উভয় পক্ষ যুদ্ধারম্ভেই ভূগর্ভে ব্যূহ খনিয়া তন্মধ্যে নিজ নিজ তোপশ্রেণী লুকাইয়া রাখিত। জাপানীগণ প্রথমেই রুস তোপের লক্ষ্যকারী চরদলকে (ovservirg parties) খুঁজিয়া খুঁজিয়া মারিত;

কিন্তু তাহারা স্বগন্ধীয় তোপের চরমদলকে সুন্দর সুকৌশলে লুকাইয়া রাখিত।

যুদ্ধারম্ভ হইতে যে কামান গোলা দাগিয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই, কেবলমাত্র সেই কামানই স্থানান্তরিত করা যায়, বা যুদ্ধে নূতন স্থানে লইয়া শত্রুক্ষয়ে নিযুক্ত করা যায়, কেবলমাত্র সেই গুপ্ত কামানই শত্রুর অলক্ষ্যে অগ্রসর হইয়া সহসা অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে আচম্বিতে শত্রুর দুর্ব্বল অংশে প্রহার করিতে পারে। যে কামান প্রথম হইতেই আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা স্থানান্তরিত করিতে যাইলে শত্রু তাহার নিশ্চেষ্ট ভাব দেখিয়া নূতন ফন্দি অনুমানে বুঝিয়া লইবে। যুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করিবার পর, কামানের ঢাল ও গোলাঘাতের মারাত্মক ক্ষিপ্রতাই কামান রক্ষার একমাত্র সদুপায়, তখন আর নূতন স্থানে কামান সরাইয়া আত্মগোপন করা চলে না।

একজন মার্কিণ পত্রের সংবাদদাতা তালিসো যুদ্ধের বিষয়ে লিখিয়াছেন, "রুষ লাইন হইতে সম্মুখে দেখিলাম দিগন্তর প্রান্তরে জনপ্রাণী নাই, কিন্তু এই নিরাপদ দর্শন প্রান্তর হইতে এরূপ প্রচণ্ড শেল ধারা আসিতেছে যে পনর মিনিটের মধ্যে ৬৪ খানি রুষ কামান অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। তখন একদল রুষ সৈন্য সদ্য স্বদেশ হইতে আসিয়া ট্রেণ হইতে নামিতেছিল, তৎক্ষণাৎ সেই শেলধারা তাহাদিগের প্রতি প্রযুক্ত হওয়ায় সেই গুপ্ত কামানের আঘাতে আধ ঘণ্টার মধ্যে ১০০ শত লোক হত ও আহত হইয়া পড়িল। এইরূপে জাপানীরা তাহাদের তোপের অগ্নিধারায় রুষ তোপ নষ্ট করিয়া আবার হেলায় তৎক্ষণাৎ সে ধারা নূতন লক্ষ্যে কেন্দ্রীকৃত করিতে পারিত। এই

ব্যাপারের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে, যে গুপ্ত-কামান হইলে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক কামানেই কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারে। গুপ্ত-কামানের পক্ষে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ান সহজসাধ্য, এবং তাহাদিগকে শত্রুর গোলায়ও বড় ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয় না।

একজন রুষ কর্ণেল গত যুদ্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "একটি শিখরের উপর কামানের জন্য খাত (Gun pits) কাটা ছিল; আমি এই শিখরের পশ্চাতে ৫০০ গজ অন্তরে সাতটি তোপ বহর (Batteries) রাখিয়া তদ্দ্বারা জাপানীদিগের ১৩টি তোপ বহরকে যুদ্ধ দিতে লাগিলাম, এবং তাহাদিগকে সমস্ত দিন তাহাদিগের স্ব স্ব স্থানে আটক করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। জাপানীরা প্রথমে শিখরোপরি কামানের খাত দেখিয়া প্রতারিত হইয়া তাহার উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল, শেষে ভুল বুঝিতে পারিয়া লক্ষ্যের দূরত্ব বৃদ্ধি করিল বটে (increased their range), কিন্তু যাহাতে গোলা রুষ লাইনে পঁহুছে ততটা বৰ্দ্ধিত করা আর ঘটিয়া উঠিল না।"

১৮৬৬ সালে মসৃণ নল কামানের (Smooth bore) পরিবর্ত্তে নূতন রাইফেল কামান ব্যবহৃত হয়; রাইফেল-কামানের নলের মধ্যে স্ক্রুর প্যাঁচের মত প্যাঁচ কাটা আছে, তাহার ফলে গোলা ঘুরিতে ঘুরিতে চলে এবং মসৃণ-নল কামানের গোলার অপেক্ষা বহুদূরে নীত হয়। এই সময়ে কামান-চালনার যে পদ্ধতি স্থিরীকৃত হয় তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল;—

১। সেনা যখন প্রথম কুচ করিয়া চলিতেছে, তখন কামান অনেক অগ্রে বাহিনীর প্রায় পুরোভাগে থাকিবে।

২। যুদ্ধের প্রারম্ভেই যত অধিক সংখ্যক সম্ভব কামান লইয়া গোলা প্রহার আরম্ভ করিতে হইবে।

৩। সমস্ত গোলন্দাজ সৈন্য ও কামান শ্রেণী একই সেনাপতির নেতৃত্বে থাকিয়া চলিবে।

৪। সমস্ত কামান এক সঙ্গে এক যোগে যুদ্ধারম্ভ করিবে; দুই চারটি করিয়া ক্রমে ক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে শত্রু অবসর বুঝিয়া অগ্নিধারা তাহাদের উপর কেন্দ্রীকৃত করিয়া বিচ্ছিন্ন কামানগুলিকে একে একে ধ্বংস করিতে পারে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে গস্তভাস আদল্‌ফাস্ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার গোলন্দাজগণকে সৈন্যে পরিণত করিয়া কোম্পানি ও রেজিমেণ্ট দলে বিভক্ত করেন। ইহার ফলে কামানের গতিবিধি ও চালনা সহজ এবং গতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। গস্তভাসই প্রথমে কামান ঘন রেখায় সাজাইবার পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

জেনারাল সার এডমণ্ড এলিস্ বলেন, "যদি তোপ বহর সকল বিক্ষিপ্ত করিতে হয়, তাহা হইলেও তাহাদিগকে নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়া একযোগে কার্য্য করাইবার জন্য যথেষ্ট সিগ্‌নালার সৈন্য বা টেলিফোন যেন থাকে, নহিলে তোপ বহর নিজ কর্ত্তৃত্বের বাহিরে যাইয়া পড়িবে। তোপ-বহরের সহিত বাহিনীর অন্যান্য অঙ্গের একযোগে কার্য্য না চলিলে কামান শত্রু হস্তগত হইবে। পদাতিক অশ্বারোহী ও তোপ বহর একসূত্রে বাঁধা থাকিয়া এক লক্ষ্যে কার্য্য করিবে। আজ কাল আমরা স্বাধীন পরিচালনা নীতির বড় অতিরিক্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি।"

অনেক তোপ বহর (Batteries) একত্রিত রাখিলে (mas-

sing) তজ্জন্য গোপন আশ্রয় না পাওয়াই সম্ভব, কিন্তু তোপ বহর গুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রাখিলে, তজ্জন্য যথেষ্ট গুপ্ত স্থান যে কোন সমর ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়; দৃষ্টান্তস্বরূপ যথা, পাঁচ মাইল স্থানের মধ্যে ৫০ বা ১০০ কামান একত্র লুকাইয়া রাখিবার মত খাত বা স্তুপরাজি সচরাচর পাওয়া যায় না, কিন্তু সেই পাঁচ মাইল স্থানে এমন হয়ত দশ পনরটি গুপ্ত স্থান পাওয়া যাইতে পারে, যাহার প্রত্যেকটিতে ৬টি বা ১২টি কামান থাকিতে পারে। বর্ত্তমান যুগের নূতন কামানের গতির দূরত্ব এত অধিক যে, কামান বহর গুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিলেও পরস্পর হইতে নিতান্ত দূরবর্ত্তী না হইলে তাহাদের বিক্ষিপ্ত অগ্নিধারাও স্বেচ্ছায় কোন লক্ষ্যে কেন্দ্রীকৃত (Centred) করা যায়।

কামান চালনায় লক্ষ্যপটুতাই প্রধান গুণ। প্রতিদ্বন্দ্বী সেনার মধ্যে এক পক্ষের যদি উৎকৃষ্ট কামান নাও থাকে, তথাপি লক্ষ্যপটুতা, আত্মগোপন শক্তি, দূরত্ব উপলব্ধি ক্ষমতা, এবং দ্রুতগামিতা প্রভৃতি গুণ সে অভাব অতি সহজেই পূরণ করিয়া লয়। কিন্তু এই সকল গুণে উভয় পক্ষের গোলন্দাজদল তুল্য হইলে অবশ্য যে পক্ষের বৃহদায়তন অথচ দ্রুতক্ষেপী ক্ষেত্রকামান (biggest field guns of the quick firer class) থাকে, সেই পক্ষেরই সুবিধা। রুষ-জাপান সমরে জাপানীগণকে নিকৃষ্টতর তোপ লইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। রুষ সেনা যে কামান ব্যবহার করিয়াছিল তাহা জাপানী কামান হইতে অধিক দ্রুতক্ষেপী, ১৫০০ গজ অধিক দূরগামী এবং তাহার গোলা শতকরা ২৫ গুণ বৃহত্তর। কিন্তু তথাপি উপরিউক্ত গুণাবলির আধার

বশিয়া জাপানী গোলন্দাজই অধিকাংশ অগ্নি-দ্বন্দ্বে (artillery duel) জয়ী হইত। "The Japanese proved themselves better range-finders, better shots, more cunning in concealment, more astute in choice of position, and more indefatigable in overcoming engineering difficulties." উপরোক্ত গুণচয় ব্যতীত তাহাদের আরও দুইটি অতি কার্য্যকরী গুণ ছিল, যথা কামানের জন্য ক্ষেত্রনির্ব্বাচন ক্ষমতা এবং যন্ত্রক গঠিত পরিখা স্তুপভিত্তি প্রভৃতি সহজে ধ্বংস করিবার দক্ষতা।

গোলন্দাজগণ সৈন্য মধ্যে পূর্ব্বে অতি হেয় হইয়া থাকিত; আজ কাল আগ্নেয়াস্ত্রের শক্তি ও উপকারিতার বৃদ্ধি হওয়ায় সেনাদলের মধ্যে ইহাদেরও সম্মান বৃদ্ধি হইয়াছে।

মহাবীর ফ্রেডারিক গোলন্দাজ সেনানীর পদমর্য্যাদার বৃদ্ধি করেন এবং যে ক্ষেত্রে সম্মুখ হইতে আক্রমণ চলে না তথায় পার্শ্ব হইতে আক্রমণের ব্যবস্থা প্রচলিত (flanking marches) করেন।

উভয় পার্শ্ব হইতে অগ্নিধারা প্রয়োগ করিলে (enfilade fire) ঢাল বড় কার্য্যকরী হয় না। বৃহদায়তন তোপের গতির দূরত্ব অধিক, সুতরাং তাহারা অপর পক্ষের গোলার বাহিরে থাকিয়াও উভয় পার্শ্ব হইতে ঘিরিয়া অগ্নি বর্ষণ করতঃ তোপের প্রহার মন্দীভূত করিয়া রাখিতে পারে, এবং সেই অবসরে অন্যান্য তোপ বহরগুলি প্রদাতিক ধ্বংসে নিযুক্ত হয়। অনেক সময়ে তোপ বহর যুদ্ধ হইতে সরিয়া যায়; যখন আক্রমণকারী বাহিনী কোন অনুকূল স্থান অতিক্রম করতঃ ধাইয়া আসিতেছে, সেই

সময়ে এই কামানগুলি সহসা বজ্রনির্ঘোষে অগ্নি উদ্গিরণ করতঃ সৈন্য ধ্বংস করিয়া দিতে পারে; এ কার্য্য এত সহসা সম্পন্ন হইতে পারে, যে অপর পক্ষীয় তোপ এ ধ্বংসকারী কামানকে বিরত করিবার অবসর পায় না। করিলেও সেই অবসরে এ পক্ষের পদাতিক তোপমুখ হইতে অব্যাহতি পাইয়া রাইফেল চালাইয়া লয়। স্বপক্ষের রাইফেলের গুলিমুখ হইতে আপন অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদলকে নির্ব্বিঘ্ন রাখিয়া খনিত ব্যূহস্থ শত্রুকে অবিশ্রাম অগ্নিপ্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া রাখা যায়। অবশ্য যতই অধিক দূর হইতে গুলি চালান যায়, সেই অগ্নিধারার প্রসার ততই কম হয়; সুতরাং স্বপক্ষীয় সৈন্যের ঘুরিবার ফিরিবার যথেষ্ট স্থান থাকে। কিন্তু দূর হইতে গুলি চালাইয়াই কেবল শত্রুকে দমনে রাখা যায় না। সুতরাং শত্রুরেখার পার্শ্বে যাইয়া আক্রমণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দুই উপায়ে এই পার্শ্ব হইতে আক্রমণ (flanking attack) সম্ভব হয়; প্রথমতঃ অতি দ্রুত-গামী অশ্ববাহিত কামান বিদ্যুদ্গতিতে অগ্রসর হইয়া শত্রু পার্শ্ব আক্রমণ করিতে পারে, ইহাদিগের দ্রুতগমন হেতু শত্রুর গুলিতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না; দ্বিতীয়তঃ খাত বা নালা বাহিয়া পার্ব্বত্য কামান (mountain artillery) অলক্ষ্যে অগ্রসর হইয়া এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে; আত্মগোপন করিবার শক্তির উপরই এই পার্ব্বত্য কামানের আত্মরক্ষা নির্ভর করে।

ফরাসী জগদ্বিজয়ী নেপোলিয়ন প্রথম বুঝিতে পারেন যে, যুদ্ধকালে কতক কামান হাতে গচ্ছিত রাখিলে কালে তাহার দ্বারা জয়শ্রী লাভ করা সহজ হয়। শত্রুরেখাকে প্রচণ্ড গোলা প্রহারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া নেপোলিয়ন যখন শত্রুব্যূহের দুর্ব্বলতা

অনুভব করিতে পারিতেন, তখন এই উদ্বৃত্ত কামান শ্রেণী (Reserve force) আনিয়া সেই মাহেন্দ্র ক্ষণে সেই দুর্ব্বল ব্যূহাংশে অমোঘ আঘাত করিয়া নেপোলিয়ন তাঁহার অপূর্ব্ব রণজয় সম্পন্ন করিতেন।

সুতরাং কামান প্রয়োগের ক্রীয়া-কৌশল (tactics) যাহা এতক্ষণ বুঝান হইল সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে তাহা সংখ্যায় দ্বাদশটি, যথা, ১ম। বাহিনীর পুরোভাগে কামানের অবস্থিতি, ২য়। একই সেনাপতির হস্তে সমস্ত কামান বহর গুলির কর্তৃত্ব ন্যস্ত করা, ৩য়। যুদ্ধারম্ভেই অগ্নি ক্রীড়ার অধিক উপযোগিতা ৪র্থ। কামান স্থাপনের জন্য ক্ষেত্র নির্ব্বাচন ক্ষমতা, ৫ম। ঘন সম্বদ্ধ রেখায় বহু কামান একস্থানে কেন্দ্রীকরণ, ৬ষ্ঠ। টেলিফোন ও ক্ষেত্র তাড়িৎবার্ত্তাবহ (field telegraph) প্রভৃতির সাহায্যে দৃঢ় সংযোগ রাখিয়া আবশ্যক মত তোপ বহরের বিস্তৃতি, ৭ম। আত্মগোপন শক্তি, ৮ম। লক্ষ্যপটুতা. ৯ম। পার্শ্ব আক্রমণ ও সংবেষ্টন, ১০ম। সমরশিল্পনাশ শক্তি, ১১শ। পার্ষ্ণীগ্রাহ তোপপল্টন, ও ১২শ। শত্রুর মন্ত্রভেদ করণ। কামানের ক্রীয়া কৌশলের সংক্ষেপতঃ ইহাই মূল কথা।

অগ্নিক্রীড়া করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিতে হয় বলিয়া যুদ্ধরেখার (line of battle) সকল অংশেই প্রায় সমভাবে তোপ সন্নিবেশ করা আবশ্যক। তবে যুদ্ধ রেখার যে যে স্থানে প্রকৃতপক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর ব্যূহভেদ করিতে হইবে বা শত্রুর প্রসারশীল সেনার পার্শ্ব সঙ্কুচন (rolling up of wings) ঘটিবে সেই সেই প্রধান কেন্দ্রে যথাসাধ্য অধিক সংখ্যক তোপের একীকরণ আবশ্যক হইয়া পড়ে। যুদ্ধক্ষেত্রে অতিমাত্র দৈর্ঘ হেতু অনেক সময়ে কামান

চালনায় ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা, হয়ত স্বপক্ষের সেনাকে শত্রুবোধে বা তাহাদিগের গতিবিধি না জানায় তাহাদিগেরই উপর স্বপক্ষীয় কামান অগ্নি বর্ষণ আরম্ভ করিল। একবার ঘন ঘন আক্রমণে রুষ সেনাকে অবশেষে বিতাড়িত করিয়া একদল জাপানী সেনা কোন এক ব্যূহাংশ করায়ত্ব করিয়া ছিল। অন্য এক জাপানী দল ইহাতে শত্রু আছে ভাবিয়া গোলা বর্ষণে সেই ব্যূহাংশ আচ্ছন্ন করতঃ অবশেষে ভীম আক্রমণে তাহা হস্তগত করিল। কিন্তু সে ভিত্তি বেষ্টনে উপস্থিত হইয়া দেখিল তাহা স্বপক্ষীয়ের শবে পূর্ণ রহিয়াছে। হতভাগ্য জাপানীগণ সেই মৃতদেহের উপর পড়িয়া হৃদয়াবেগে ক্রন্দন করিতে লাগিল। এই প্রকার ভ্রম নিবারণ করিবার জন্য নিশান ব্যবহার করা আবশ্যক এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত সমস্ত সেনা ও সেনাঙ্গের পরস্পরের সহিত সংযোগ রক্ষা কর্ত্তব্য। কোথায় কি ঘটিতেছে অবিশ্রাম চরমুখে শুনিতে পাইলে আর কেহ এ প্রকার ভুল করে না। নিজ পক্ষের সৈন্য রণাঙ্গণের যে যে অংশ অধিকার করিয়াছে তৎ তৎ স্থানে নিশান উড়াইয়া দিলেও এ ভ্রম নিবারিত হইতে পারে।
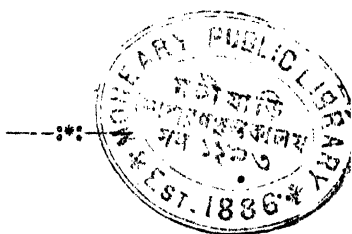
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আক্রমণকাণ্ড।

প্রারম্ভিক অগ্নি ক্রীড়া করিতে করিতে ক্রমে আক্রমণের সন্ধিক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রতিপক্ষের কামান অধিকাংশ অকর্ম্মণ্য হইয়া নিস্তেজ হইয়া আসিলে তখন পদাতিকের অগ্রসর হইবার সময়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে যে অগ্নিক্রীড়ার ফলে এক পক্ষের কামান হীনবল হইবে তাহা নহে, না হইলেও তিন চার ঘণ্টাব্যাপী কামান ক্রীড়ায় শত্রুকে কতকটা বিপর্য্যস্ত করিয়া তাহার কামান ও পুরোগামী সেনার রাইফেল অগ্নি গোলার প্রতিঘাতে আচ্ছন্ন রাখিয়া সেই অবসরে ধীরে ধীরে সৈন্য প্রক্ষেপ করিতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু উভয় পক্ষের এই অবিরাম শেল ও শ্রেপনেল বৃষ্টির ফলে দুর্ব্বল পক্ষের অধিকাংশ কামান না ভাঙ্গিলেও তাহার শিক্ষায় দোষ, বা লক্ষ্যের অপটুতা, তাহার কামানের নিকৃষ্টতা ও সংখ্যার অল্পতা বা সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে কামান বিস্তৃতি ও কেন্দ্রীকরণের চাতুর্য্যাভাব প্রভৃতি কোন না কোন ছিদ্র বুঝিলেই অমনি নানা কৌশলে সম্মুখে সৈন্য প্রক্ষেপ করিয়া ছিদ্রাবলম্বনে সেনা রেখার দুর্ব্বলাংশে ব্যূহভেদ করিতে চেষ্টা করে।

উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী সেনার ব্যূহ বিন্যাসের মধ্যে যে এক দুই ক্রোশের ব্যবধান থাকে তাহা ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আসে, কারণ অগ্নিক্রীড়া করিতে করিতে উভয় সেনা স্ব স্ব খাত, স্তূপ-বেষ্টন, প্রভৃতি অতি শনৈঃ শনৈঃ পরস্পরের দিকে অগ্রসর করিতে থাকে। সেনা দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান অতিক্রম করিয়া আক্রমণ করিতে গিয়াই প্রকৃত পক্ষে অধিক সৈন্যক্ষয় হয়, এই ব্যবধান-ভূমি দুই পক্ষের সহস্র সহস্র রাইফেল ও শ্রেপনেল অগ্নিতে সদা আচ্ছন্ন হয়। তাহা অতিক্রম করিয়া শত্রু রেখায় পঁহুছিতে দলে দলে সৈন্য প্রাণত্যাগ করে। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের সমরক্রীড়া-কৌশলের মুখ্য উদ্দেশ্য এই অগ্নিব্যাপ্ত ব্যবধানদেশে (zone of fire) সৈন্য ক্ষয় নানা উপায়ে নিবারণ করা। প্রতিপক্ষের ব্যূহরেখায় উপস্থিত হইয়া শত্রু সেনার সহিত সংঘর্ষ আরম্ভ হইলে অবশ্য সৈন্যনাশ অনিবার্য্য, কিন্তু তৎপূর্ব্বে যে সহস্র সহস্র শিপাহী মরে তাহা নিবারণ করিতে যথেষ্ট চেষ্টা না করিলে চলে না। শত্রু অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বা ত্রিভূজ রেখায় সন্নিবিষ্ট হইয়া নানা দিক হইতে সহস্র সহস্র রাইফেল হস্তে এই ব্যবধান ভূমে অগ্নিধারা কেন্দ্রীকৃত করে। এই কেন্দ্রীভূত অগ্নিপ্রহার কি ভীষণ তাহা শস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই উপলব্ধি করিবেন। চার পাঁচ সহস্র রাইফেল নল হইতে মিনিটে তিন লক্ষ গুলি ছুটিলে সে ধারার সম্মুখে অগ্রসর হওয়া মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে; পাঁচ দশ সহস্র সৈন্য অগ্রসর হইলেও মাত্র সহস্র জন শত্রুরেখায় জীবিত অক্ষত শরীরে পঁহুছিতে পারে কি না সন্দেহ। আক্রমণের পূর্ব্বে অতিক্রম করিবার এই অগ্নিব্যাপ্ত ব্যবধান দেশ (zone of fire) যত দীর্ঘ হইবে, তাহা

অতিক্রম করিয়া শত্রুরেখায় উপস্থিত হইতে ততই বিলম্ব হইবে, সুতরাং এই অগ্নিসমুদ্র সন্তরণ চেষ্টায় মিনিটে যদি দুই হাজার লোক মরে, তাহা হইলে দুই মিনিটে চার হাজার, পাঁচ মিনিটে দশ হাজার মরিবে, সুতরাং নানা উপায়ে এই ব্যবধানের দূরত্ব হ্রাস করা আবশ্যক। সেনার সহিত যে যন্ত্রক ও খনক পল্টন থাকে তাহারা রাত্রের অন্ধকারের আশ্রয়ে এবং দিবাভাগে স্বপক্ষীয় কামানের গোলার আশ্রয়ে সম্মুখস্থ ব্যূহরেখা ক্রমেই শত্রু অভিমুখে বিস্তৃত করিয়া লইয়া চলে। বর্ত্তমান যুদ্ধের আক্রমণ ব্যাপার অল্পায়াসে ও অল্প সৈন্য ক্ষয়ে সহজে নিষ্পন্ন করিতে হইলে প্রধানতঃ ছয়টি উপায় অবলম্বনীয়, ১ম। ব্যবধান ভূমির দূরত্ব হ্রাস, ২য়। ক্ষেত্ররচনা ও আশ্রয়ের (covers) ব্যবহারজ্ঞান, ৩য়। রাইফেল ও কামানের অগ্নির আশ্রয়ে অগ্রগমন, ৪র্থ। আক্রমণের সময়ে তরল রেখায় বিভাগ, ৫ম। খণ্ডশঃ প্রধাবনে অগ্রগমন, এবং ৬ষ্ঠ। পার্শ্বআক্রমণ ও সংবেষ্টন। এই উপায় গুলি প্রত্যেকটি বিবৃত করিয়া না বুঝাইলে পাঠকের বোধগম্য হইবে না। ব্যবধান ভূমির (zone of fire) দূরত্ব হ্রাস বিষয়ে যথেষ্ট বলা হইয়াছে, অবশিষ্ট যাহা বলিবার আছে তাহা দ্বিতীয় উপায় স্বরূপ ক্ষেত্ররচনা ও আশ্রয়ের ব্যবহার জ্ঞানের আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে।

ক্ষেত্ররচনাকৌশলী খনকদল ও যন্ত্রক সৈন্য থাকিলেই তবে একটি সেনা তাহার সমরক্রীয়া-কৌশলের সম্যক প্রয়োগ করিতে পারে। কারণ অস্ত্রমুখ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া নিজ ক্ষেপকাস্ত্রের পূর্ণব্যবহার করিবার সহায়ক আশ্রয়াদি (covers) ইহারাই নির্ম্মাণ করে। পূর্ব্বে রণনীতিতে বিশাল প্রাসাদবৎ

উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গাদিরই অধিক ব্যবহার ছিল। আজ কাল দুর্গনির্ম্মাণ পদ্ধতি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন দুর্গ গড়িবার জন্য পর্ব্বতবহুল তুঙ্গ স্থান না হইলেও চলে। সমতল প্রান্তরেও এরূপ দুর্গম ও দুর্জ্জয় সন্নিবেশকেন্দ্র (fortified position) নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে যে তাহা হস্তগত করিতে দশ পনর সহস্র সৈন্য ক্ষয় হইয়া যায়। পূর্ব্বে এত ভীষণ মারাত্মক অস্ত্র ছিল না বলিয়া দুর্গ এরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করা হইত যে, তাহাতে কেহ যেন বহু চেষ্টায়ও প্রবেশ না করিতে পারে। আজ কাল দুর্গের গঠন প্রণালীর এক মাত্র লক্ষ্য এই যে, যেন আততায়ী সেনা দুর্গ প্রতি প্রধাবিত হইলে পথে বহুবার বাধা পায়। দুর্গের সম্মুখবর্ত্তী ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান দুর্গাভ্যন্তরস্থ সেনার নালিকা ও তোপের অগ্নিতে মথিত হইতেছে, সুতরাং দুর্গাক্রমণে ধাবমান আততায়ী সেনা পথে বাধা পাইতে পাইতে শত্রুর সন্নিহিত হইতে যতই বিলম্ব করিয়া ফেলে ততই এই অজস্র বর্ষিত গোলা গুলির আঘাতে দলে দলে প্রাণ হারায়। এই বাধা ও আত্মরক্ষী সেনার গুপ্তাশ্রয় কত প্রকারের হয় এখন তাহাই আলোচ্য। সেনার গুপ্তাশ্রয়ের মধ্যে ইস্পাতের মৃত্তিকা-প্রোথিত কক্ষই (bombproof shelters) প্রধান। ভূমিতে গর্ত্ত খনিয়া তাহার উপর স্থূল ইস্পাতের পাত দ্বারা ছাদ তৈয়ার করিয়া লইতে হয়, ইহার উপর শেল পড়িলেও শীঘ্র ভেদ করিতে পারে না ; কখন এই ছাদের উপর স্তুপাকারে মৃত্তিকাও দেওয়া থাকে। সুদৃঢ় সেনানিবেশ গুল্মের (redout or fortified position) কেন্দ্রে অর্দ্ধ চক্রাকারে শ্রেণীবদ্ধ এই প্রকার ইস্পাত গৃহ থাকে, ইহাতেই রসদ আয়ুধাগার (arsenal) ও প্রত্যাসার সেনা

(reserve) লুকাইত রাখা হয়। ইহার চতুর্দ্দিকে ত্রিভূজ অতিস্থূল তুঙ্গ প্রাচীর (parapet) বেষ্টন, এই প্রাচীর এরূপ দৃঢ় যে উপর্য্যুপরি শেলের আঘাত সহিয়াও অভগ্ন থাকে। এই প্রাচীরবদ্ধ বিষমকোণী ত্রিভূজের শিরাগ্রে ও উভয় বাহুর অর্দ্ধেক অবধি স্থান ব্যাপিয়া সেই ভিত্তিগর্ভ রন্ধ্রময়। প্রাচীরগর্ভের রন্ধ্রেও ইস্পাতের পাতমণ্ডিত অতি সুকৌশলে গঠিত কক্ষ আছে, প্রাচীর বেষ্টনের মাঝে মাঝে ৫০ গজ ব্যবধানে এক একটি সুরক্ষিত তোপবুরুজ থাকে। প্রাচীরের (line of parapets) অব্যবহিত নিম্নেই অতি গভীর খাত, তোপবুরুজের কামানগুলি এরূপ ভাবে সজ্জিত যে তাহাদের অগ্নিধারায় সেই দীর্ঘ খাতের (ditches) সকল অংশই আচ্ছন্ন করা যায়। এই খাতের মধ্যে জল আছে, এবং তাহাতে সকণ্টক লৌহতার (barbwire) লৌহ ফলা (spikes) এবং কর্ত্তিত বৃক্ষকাণ্ড ডুবান থাকে। সুতরাং গুল্ম দুর্গের কেন্দ্রে ইস্পাত কক্ষ, তাহার প্রথম মণ্ডলে স্থূল সরন্ধ্র প্রাচীর রেখা এবং দ্বিতীয় মণ্ডলে গভীর কণ্টক ফলা সঙ্কুল সজল খাত আছে। এই দ্বিতীয় মণ্ডলের পর কিছু ব্যবধান রাখিয়া তৃতীয় মণ্ডলের সৃষ্টি হইয়াছে, এ মণ্ডল সকণ্টক তারের (barb wire) ঘন বেড়া মাত্র; এই বেড়ার নিম্নে অতি কৌশলে লুকাইত বহু গর্ত্ত আছে। এই গর্ত্তগুলি মানুষ ধরিবার কল বা ফাঁদ বিশেষ, ইহা এক একটি তিন চার হাত গভীর এবং মুখের দিকে স্থূল হইয়া ক্রমে অপরিসর হইয়া একটি বৃহৎ জলপাত্রের (glass) আকার ধারণ করিয়াছে। প্রত্যেক গর্ত্তের নিম্নে অভ্যন্তরে এক একটী তীক্ষ্মমুখ শূল রোপিত, এবং সুকৌশলে প্রচ্ছন্ন এই শ্রেণী-

গুল্ম দুর্গ।
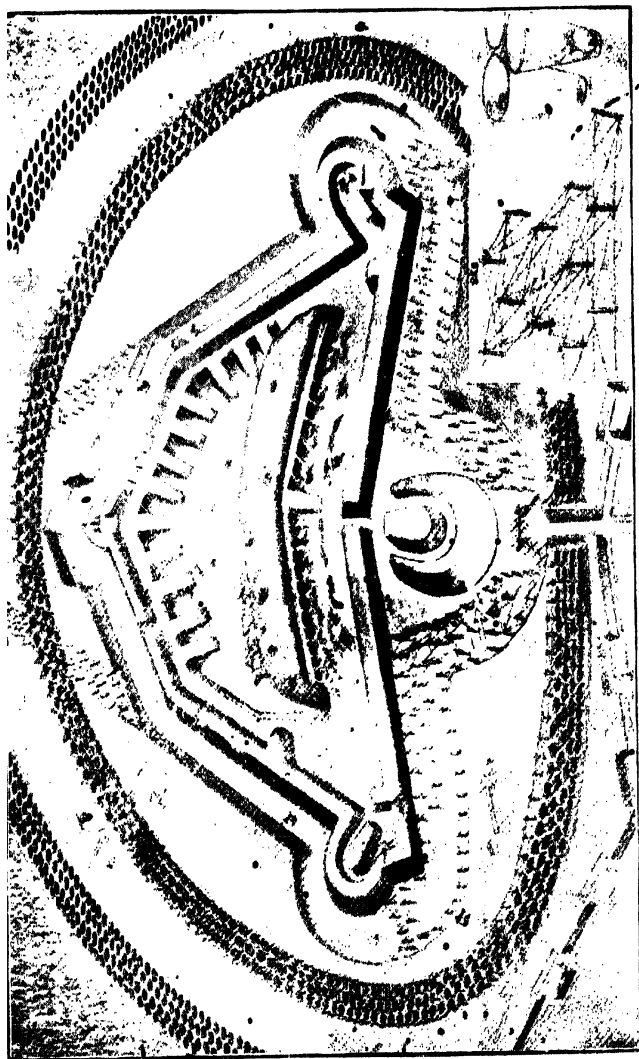
বিন্যস্ত গর্ত্ত গুলির উপরের সকণ্টক তারের বেড়া, তাহাতে অতি তীব্র প্রাণনাশক বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইতেছে।

জল পরিখাও এই তারবেষ্টনের মধ্যবর্ত্তী যে ব্যবধান ভূমি আছে তাহা দেখিলে উন্মুক্ত বাধাহীন নিরাপদ স্থান বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু আবশ্যক হইলেই গুল্মের নানাদিক হইতে কেন্দ্রী-ভূত অগ্নি ইহাকে আচ্ছন্ন করিয়া মৃত্যু কটাহে পরিণত করিতে পারে ; অধিকন্তু এই আপাততঃ নির্ব্বিঘ্ন ভূমিতে অতি শক্তিমান স্থল-বোমা (land mines) রোপিত আছে, এই মৃত্তিকাগর্ভস্থ বোমার উপরে পদক্ষেপ করিবামাত্র তাহা ফাটিয়া বহু সৈন্য ধ্বংস করে। সুতরাং পরিখারেখার পর এই বোমা-সঙ্কুল ব্যবধান স্থল এবং তৎপরে তৃতীয় মণ্ডলস্বরূপ বিদ্যুৎতার বেষ্টন ও গুপ্ত গর্ত্তরাজি। তৃতীয় মণ্ডলের পর আবার পূর্ব্বরূপ ভূমি ব্যবধান এবং তৎপরে পুনরায় গর্ত্তের শ্রেণীবিস্তার, প্রভেদের মধ্যে এই গর্ত্তগুলি গুপ্ত নহে, প্রকাশ্যভাবে শূলজিহ্ব মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। সকলের বাহিরে প্রাচীরের বেড়, ইহার মধ্যে মধ্যে চতুষ্কোণ প্রাচীর বেষ্টিত সৈন্যনিবেশ স্থান আছে, তথায় রাইফেল হস্তে সৈন্য গুল্ম রক্ষা করে।

পোর্ট আর্থার দুর্গের চতুর্দ্দিকে যে অগণ্য গুল্ম দুর্গ ছিল, তাহার একটির বর্ণনা যথাযথ উদ্ধৃত হইল, ইহা পাঠে গুল্ম নির্ম্মাণ পদ্ধতি কতকটা উপলব্ধি করা যায়। "Two lunettes or flanked redans, each in plan forming the equal sides of an isosceles triangle, with shorter perpendiculars at their unjoined ends, were constructed. Deep moats, in which were built bombproof defences, roofed with

steel plate covered with earth, surrounded them. In front, connectig the apices of the lunettes, which measured thirty yards across their open faces, was a vast crown work. It extended like a hollow square across the valley-head between Fort Er-lungshan and Pûn-lungshan. The parapets and walls were of earth not less than 25ft thick. Behind these, balks of timber, iron plates, &c, covered with many feet of earth, constituted shelters safe from fire for the garrison. This great work was defended by no fewer than two field guns, and four machine guns, disposed in the west lunette and east and west rear lunettes. Besides these inner defences, three great fougasses or mines, filled with huge stones, to explode by electricity were dug and carefully hidden in front of the crown work. Inside, again, were torpedo tubes, fish torpedoes, and last but not least, 1000 stout siberian riflemen."

ইহা ব্যতীত যুদ্ধক্ষেত্র, আশ্রয় বহুল করিবার জন্য রাশি রাশি মৃত্তিকা দীর্ঘরেখায় প্রক্ষেপ করত: স্তুপাবলি রচিত হয়। এক প্রকার গুপ্তখাত (trenches) প্রস্তুত করা হয়, ইহা চার পাঁচ হাত গভীর এবং সোপানের ন্যায় থাক বিশিষ্ট। ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সৈন্য আবশ্যকমত যথা ইচ্ছা কামান ও প্রচুর পল্টন চালনা ও কেন্দ্রীকৃত করে। এই সকল ব্যূহাংশে ইস্পাতের বিশাল

ঢালের আশ্রয়ে কামানরাজি সজ্জিত থাকে, এবং যান্ত্রিক আলোকের প্রোজ্জ্বল জ্যোতিঃ সদা চঞ্চল অবস্থায় রাত্রেও শত্রুরেখা আলোকিত রাখে।

যুদ্ধকালে সৈন্যকে স্বয়ং বুদ্ধিপূর্ব্বক এই সকল কৃত্রিম এবং যথালভ্য অকৃত্রিম আশ্রয়ে আত্মগোপন করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। চতুর যুদ্ধপটু সৈন্য ভূমির সামান্য উচ্চতা বা নিম্নত্বের অন্তরালে এরূপ কৌশলে ঘুরিতে ফিরিতে পারে যে, শত্রু সহজে তাহাদিগকে আহত করিতে পারে না। আক্রমণকারী সৈনাদ্বয় প্রথমে পরস্পর হইতে দূরে থাকিয়া বলবিন্যাস করে, কারণ কামানকে আত্মরক্ষার জন্য প্রতিপক্ষের কামানের গতির বাহিরে থাকিতে হয়, এবং রাইফেলধারীকেও শত্রুর গুলিগতির এরূপ ব্যবধানে স্থান লইতে হয় যেখানে শত্রুর গোলাগুলি পঁহুছে, কিন্তু যথেষ্ট মারাত্মক হয় না। তাহার পর নিজ নিজ খাত পরিখা স্তূপ ভিত্তি বুরুজ প্রভৃতি ধীরে ধীরে সম্মুখে বিস্তৃত করিতে করিতে মধ্যের ব্যবধান-ভূমি সঙ্কীর্ণ করিয়া আনে। সকল সময়ে কেবল যন্ত্রক ও খনক সৈন্যের সাহায্যে খাত পরিখা খনিয়া খনিয়া অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না, কারণ এ উপায়ে দুই এক ক্রোশ ব্যাপী দীর্ঘ ব্যবধান সঙ্কোচ করিতে অনেক বিলম্ব ঘটিয়া যায়। সুতরাং যে আততায়ী তাহাকে মুহুর্মুহু খাত স্তূপের আশ্রয় ত্যাগ করতঃ ভীমবেগে শত্রু রেখায় আপতিত হইতে চেষ্টা করিতে হয়। এক এক বারের এই প্রকার দুঃসাহসী চেষ্টায় সৈন্যদল কতকদূর অগ্রসর হইয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রহস্তে তথায় মৃত্তিকাস্তূপ (entrenchments) রচনা করিয়া ফেলে। নবনির্ম্মিত আশ্রয়ের অন্তরালে সৈন্য নির্ব্বিঘ্ন হইলে, তখন

পশ্চাতের ব্যূহ ক্রমে বিস্তৃত হইতে হইতে এই পুরোভাগস্থ স্তপরাজিতে সংযুক্ত হয়, এবং গুপ্ত সৈন্য আবার পূর্ব্ববৎ আক্রমণ ও আশ্রয়খনন লীলার অভিনয় করে। সুতরাং আজ কাল যুদ্ধ প্রধানতঃ অনুকূল সন্নিবেশ-কেন্দ্র (positions) লইয়াই ঘটে। আততায়ীকে সম্মুখে ক্রমান্বয়ে যত অনুকূল সন্নিবেশ-ভূমি একে একে করায়ত্ব করিতে হইবে এবং আত্মরক্ষী পক্ষকে প্রাণপণে পশ্চাৎপদ হইতে হইতেও নানা পূর্ব্বদৃঢ়ীকৃত কেন্দ্র রক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে। "In these days when the spade is hardly a less important military weapon than the rifle and the sword, an extra week's work in the construction of entrenchments may mean great things in a later phase of the compaign." ব্যূহ খননের যন্ত্রাদিও আজকাল রাইফেলের ন্যায় অতি আবশ্যকীয় অস্ত্র, এবং খনিত খাতস্তুপাদি যত দৃঢ় যত দুরাক্রম্য করা যায় সমরের পরিণামে ততই শত্রু-পীড়নের সুবিধা হইয়া আসে। এই প্রকারে আক্রমণের পর আক্রমণে মধ্যের ব্যবধানভূমি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিলে তখন প্রকৃত দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। শত্রুর সৈন্য যত সংখ্যক সম্ভব কামান ও রাইফেল শ্রেণী একত্র করিয়া যখন এই অপরিসর ব্যবধান ক্ষেত্র অগ্নিঘাতে মন্থন করিতেছে, তখন সেই অগ্নিসিন্ধু সন্তরণ করিয়া শত্রুরেখায় পঁহুছিতে হইলে তরল রেখায় অগ্রসর হইতে হয়। প্রত্যেক দুইজন সিপাহীর মধ্যে ৬।৭ হাতের ব্যবধান রাখিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইলে যথেষ্ট হতাবশিষ্ট সৈন্য শত্রুরেখায় অক্ষত দেহে পঁহুছিতে পারে; বস্তুত কি আক্রমণ কি আত্মরক্ষা কোন সময়েই সৈন্যরেখা ঘনবদ্ধ হইয়া থাকিবে না। কারণ রাই-

ফেলের গুলি সরল পথে চলে এবং মিনিটে ৬০টি করিয়া চলে, সুতরাং ১০০০ হাজার রাইফেল মুখ হইতে মিনিটে ষাট হাজার গুলি ছুটিলে সে ধারার সন্মুখে ঘন রেখায় আগুয়ান হওয়ায় বহু লোকের মৃত্যু নিশ্চিত; পাতলা ভাবে অৰ্দ্ধ মাইল পথ ছড়াইয়া ঢিপি, নালা খাত বা ঝোপ জঙ্গলের আড়ে আড়ে অগ্রসর হইলে মৃত্যু সংখ্যা কম হইবে।

ব্যবধান ভূমি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইলেও সচরাচর অর্দ্ধ বা সিকি ক্রোশ দীর্ঘ হয়, সুতরাং এ দীর্ঘ পথ একেবারে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করা বাতুলতা। শত হস্ত বা পঞ্চাশ হস্ত পরিমান ভূমি তীরবেগে অতিক্রম করিয়া ভূমির বন্ধুরতা বা ঝোপ জঙ্গলের অন্তরালে একবার লুকাইয়া অবসর অনুসন্ধান করিতে হয়, অনুকূল সময় বুঝিয়া আবার উঠিয়া ত্বরিৎপদে কতক পথ ছুটিয়া আবার পুর্ব্ববৎ ভূমে শুইয়া পড়িতে হয়। এইরূপে প্রধাবনের পর প্রধাবনে (series of rushes) ব্যবধান ভূমি অতিক্রম করিলে অবশেষে শক্ররেখায় আপতিত হইবার কাল সমাগত হয়।

"modern attacks mean all covers renounced, guns held in abeyance, set determination, lust of battle, utter indifference to death and cold steel." বর্ত্তমান কালের আক্রমণ অর্থে বুঝায় সকল খাত পরিখার আশ্রয় বিসর্জ্জন করতঃ বহির্গমণ, স্বপক্ষের কামানের অগ্ন্যুদ্গম হইতে বিরতি, অটল প্রতিজ্ঞা, রণমদমত্ততা, মৃত্যুভয় বিস্মরণ এবং সঙ্গীন ব্যবহার। যখন শক্ররেখায় পড়িয়া সৈন্য যুঝিতেছে, তখন স্বপক্ষের কামান অগ্নি বমনে বিরত হয়, কারণ তখন

গোলা চালাইলে তাহার আঘাতে আপন সৈন্যও মরিবার সম্ভাবনা থাকে। আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্ব অবধি যতক্ষণ প্রধাবন ও আত্মগোপন চলিতেছে, ততক্ষণ রাইফেলও বড় ব্যবহার করা যায় না; এবং শত্রুরেখায় পঁহুছিয়া সঙ্গীন ব্যতীত আর বড় কিছুই ব্যবহার চলে না। তবে যখন একদল সম্মুখে প্রধাবিত হইতেছে, তখন পশ্চাতে ব্যূহমধ্যে বা সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া অপর একদল গুলি চালাইয়া শত্রুকে রণ দেয় (keeps down the enemy's fire), এবং সেই অবসরে তাহার আশ্রয়ে প্রথম দল ছুটিয়া অগ্রসর হয়। আবার পরক্ষণেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দ্বিতীয় দল অগ্রবর্ত্তী হয় ও প্রথম দল অগ্নিধারায় শত্রু-রেখা সমাচ্ছন্ন রাখিয়া তাহাদের প্রধাবনের সহায়তা করে। রণদুর্ম্মদ সেনার বর্ত্তমান আক্রমণ পদ্ধতি সংক্ষেপতঃ এইরূপ।

সংবেষ্টন।

স্বকীয় ব্যূহ বা নিবেশকেন্দ্র ত্যাগ করিয়া আপন উভয় পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ রক্ষা করতঃ শত্রুর সম্মুখ রেখা আক্রমণকেই সম্মুখ আক্রমণ বলে। যে যুদ্ধে প্রধাবনের পর প্রধাবনে আক্রমণের পর আক্রমণে উপর্য্যুপরি কেবলই শত্রুরেখার পূরোভাগ বিপর্য্যস্ত করিয়া তাহাকে রণাক্ষম দুর্ব্বল করা হয়, সেই পুনঃ পুনঃ সম্মুখাক্রমণ কৌশলকে Algerian tactics বলে। এই কৌশল প্রয়োগেই অনেক সময়ে কার্য্যোদ্ধার হইয়া থাকে। কিন্তু পার্শ্ব বা পশ্চাৎ আক্রমণ না করিয়া কেবল সম্মুখ সংঘর্ষে জয়লাভ করিতে হইলে সচরাচর বহু সৈন্যক্ষয় অনিবার্য্য। আত্মরক্ষাপরায়ণ ব্যূহস্থ সেনা স্বভাবতঃই তাহার যথালভ্য

সৈন্যশক্তি ও অস্ত্রশক্তি পুরোভাগ রক্ষার্থেই নিয়োজিত করে। বিশেষতঃ পার্শ্ব বা পশ্চাতে আক্রমণ সম্ভাবনা নাই বুঝিলে প্রতিপক্ষ নিজ প্রায় নিখিল বল সংহরণ করিয়া তদ্বারা সম্মুখ রেখা বিপুলতর ও দীর্ঘতর করিয়া আত্মরক্ষা করিতে করিতে আততায়ীকেই বেষ্টন করিবার চেষ্টা করে। রুষ জাপান সমরে নান্‌শানের যুদ্ধে যুদ্ধভূমি এত সঙ্কীর্ণ ছিল যে তথায় সম্মুখ আক্রমণ ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না, তাই এক নান্‌শানের যুদ্ধেই জাপানীগণকে প্রায় অর্দ্ধলক্ষ সেনা ক্ষয় করিতে হইয়াছিল; উভয় পার্শ্বে সমুদ্রের বেলাভূমি ও মধ্যে দেড় ক্রোশ পরিসর ভূমিখণ্ড, তাহাই নানশানের রণাঙ্গণ। সুতরাং যুদ্ধকালে উভয় পক্ষের বাম ও দক্ষিণ সেনাপার্শ্বকে আকণ্ঠ জলে নিমজ্জিত হইয়া অস্ত্র চালনা ও গতিবিধি করিতে হইয়াছিল। নান্‌শানে যে একেবারেই পার্শ্বাক্রমণ হয় নাই তাহা নহে, তবে তাহা এতই সামান্য যে উল্লেখযোগ্য নহে।

যে সেনা বিপক্ষদলকে পার্শ্বাক্রমণে পর্য্যস্ত করিতে মনস্থ করিয়াছে, সে আপন সন্মুখরেখা এত দীর্ঘ ভাবে রচনা করিবে যেন সে রেখার প্রান্তদ্বয় শত্রুরেখাকে অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত থাকে। এইরূপে যতদূর সম্ভব শত্রুর অজ্ঞাতে নিজ পুরোরেখা বিস্তৃত করতঃ তাহার উভয় সীমায় বিশেষ শক্তিমান এক এক চতুরঙ্গিণী অনীকিনী স্থাপন করিবে। তাহার পর সহসা ভীমবিক্রমে সম্মুখ আক্রমণ আরম্ভ করিয়া শত্রুকে এরূপ ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিতে হইবে যেন তাহার সমগ্র পুরোভাগ রণে নিযুক্ত হইয়াও অন্যান্য অংশ হইতে বল আহরণ করিয়া সন্মুখে না আসিলে আর সে বেগ ধারণ করিতে না

পারে। এইরূপে প্রতিপক্ষের অধিকাংশ সেনাকে সম্মুখে ব্যস্ত রাখিয়া উভয় পার্শ্ব দুর্ব্বল করিয়া লইতে পারিলে তখন পার্শ্ব আক্রমণের অনুকূল কাল সমাগত হয়। তখন সেই বহুদূর প্রসারিত অনীকিনীসম্বল প্রান্ত ভূজদ্বয় ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে সন্তর্পণে শত্রুর পার্শ্বদ্বয় বেষ্টনের জন্য অগ্রসর হয়। পুরোভাগে ঘোর যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত শত্রু সহসা উভয় পার্শ্বে আক্রান্ত হইলেই বিপন্ন হইয়া পড়ে, তাহাকে বাধ্য হইয়া সম্মুখ হইতে, নানা সন্নিবেশকেন্দ্র হইতে এবং প্রত্যাসার সেনা হইতে সৈন্যবল সরাইয়া আক্রান্ত পার্শ্ব দ্বয় রক্ষায় মনোনিবেশ করিতে হয় এবং সে পার্শ্বগ্রাসের বেগ ধারণ করিতে না পারিলে অবিলম্বে পশ্চাদপদ হইতে হয়। "When one of an enemy's flanks is laid bare and his centre shows signs of wavering the fighting on the other flank can hardly readjust the balance." এই প্রকার চতুর সমরকৌশলের ফলে যখন বিপক্ষের কেন্দ্র ও পুরোভাগে দৌর্ব্বল্যের চিহ্ন প্রকাশ পায় এবং এক পার্শ্ব নির্ম্মম প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে, তখন অপর পার্শ্ব অত্যন্ত শক্তিমান ও আক্রমণরোধে সমর্থ হইলেও এই সম্মুখ ও পার্শ্ব বিপর্য্যয়ের ফল ভোগ করে—ক্ষণিক জয়লাভ সত্বেও পশ্চাদপদ হয়; তখন এই আততায়ী সেনার উভয়-পার্শ্বাক্রমণশীল ভুজ যুগ আরও বিস্তৃত হইয়া আচম্বিতে দুই দিক হইতে পশ্চাদভাগ বেষ্টনের চেষ্টা করে। ঠিক যেমন মানুষ মানুষকে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া উভয় বাহুতে তাহার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্ব বেড়িয়া পৃষ্ঠে উভয় বাহু সম্মিলিত করে, তেমনি এই প্রসরণশীল বেষ্টনকারী সেনাভুজদ্বয় দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর।

আকারে ছড়াইতে ছাড়াইতে আপন উভয় প্রান্ত শত্রুর পৃষ্ঠদেশে বহুদূরে তাহার লক্ষ্যের বাহিরে যাইয়া মিলিত করে। বেষ্টিত শত্রু যখন আপন বিপন্ন অবস্থা বুঝিতে পারে তখন হয়ত পরি-বেষ্টন কার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে।

Hœnig, the very wellknown German military writer believes the wars of the future to be mostly wars of "Circumvallation" which is a form of envelopment. It presupposes big battations and immense labour in the execution of preliminary preparation, the utmost care in procuring accurate information of the enemy's movements, and considerable activity in drawing in the net when oncee it has ben spread. But it is notably effective, mor) specially as regards moral effect, for the bravest troops, who will cheerfully face any odds as long as the enemy are farely and squarely to their direct front, may become unsteady when they begin to perceive attackers closing in upon them, sometimes from all the points of the compass."

জার্ম্মাণ রণনীতিপণ্ডিত হিনিগ বলেন যে ভবিষ্যতে যুদ্ধ অর্থে কেবলমাত্র নানা পরিবেষ্টন কৌশলের লীলা বুঝাইবে। সুতরাং ভবিষ্য সমরে এতদর্থে কি কি চাই?—অগণ্য সেনাদল, শত্রুর গতিবিধির সংবাদ গ্রহণে অতুল যত্ন এবং জাল বিস্তার করিয়া তাহা অতি দক্ষতা ও ত্বরাপূর্ব্বক টানিয়া সঙ্কুচিত করা।

পরিবেষ্টনের ফল শক্রর মানসিক বুদ্ধিবিপর্য্যয়, কারণ যে অতি সাহসী বীর সৈন্য সম্মুখ সমরে কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে না, সে সেনাও চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইলে বিচলিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে।

যুদ্ধের সময়ে স্বপক্ষীয় সেনার বল সংখ্যা ও অস্ত্রশক্তি যেরূপ প্রচ্ছন্ন রাখিতে হয়, কি কৌশলে কোন্ নীতির প্রয়োগে শত্রু-ব্যূহের কোন্ বিশেষ অংশ আক্রমণ করা হইবে তাহাও তেমনি নানা উপায়ে গুপ্ত রাখিতে হয়। আয়োজন-নীতির প্রথমার্দ্ধের অন্তর্গত মন্ত্রগুপ্তি ও আত্মগোপন শীর্ষক অংশে ইহা কতক পরিমানে বুঝান হইয়াছে। কিন্তু ২০।২৫ মাইল দীর্ঘ যুদ্ধরেখার (battle line) কোন্ স্থানে যুদ্ধের প্রকৃত রুদ্রমূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়া প্রতিপক্ষের ব্যূহভেদ করিবে তাহা গুপ্ত রাখিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় আছে। ইহা আয়োজন-নীতির এক আবশ্যকীয় অঙ্গ বলিয়া আমরা ইহাকে পৃথক নীতি রূপে ধরিলাম।

আজ কাল এক এক পক্ষে প্রায় দুই তিন লক্ষ পর্য্যন্ত সেনা সমবেত হইয়া একটিমাত্র যুদ্ধের অভিনয় করে; সুতরাং সেনা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে ইহার সম্মুখভাগ বা যুদ্ধরেখা ১০।২০ এমন কি ৪০ মাইল অবধি দীর্ঘ হয় এই দীর্ঘ রেখায় উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী সেনা যখন সশস্ত্র যুদ্ধোন্মুখ হইয়া পরস্পরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, তখন এক পক্ষের সেনাপতি ও সেনানীগণের কর্ত্তব্য যে প্রতিপক্ষের সেনা সন্নিবেশ পদ্ধতি, তাহার অগ্রগামি রক্ষীদিগের ও গুল্ম সৈন্য দলের কার্য্য কলাপ, তোপ সাজাইবার স্থান ও রীতি ইত্যাদি

লক্ষ্য করিয়া তাহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক বুঝিয়া লইবে যে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রতিপক্ষ যুদ্ধরেখার কোন্ বিশেষ অংশে পূর্ণশক্তি প্রকাশ করতঃ ব্যূহভেদ বা যুদ্ধ জয় করিবে। এই স্থান পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতেপারিলে তথায় গুপ্তভাবে যথেষ্ট প্রচ্ছন্ন কামান সঞ্চিত প্রত্যাসার সৈন্য (reserve)এবং অব্যর্থ সন্ধানী রাখিয়া যথা সময়ে শত্রুর কৌশল ব্যর্থ করা যায়। কোন যুদ্ধে আততায়ী পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া রাখে যে শত্রুর সন্মুখ-ভাগ প্রথমে যথেষ্ট বিপর্য্যস্ত করিয়া সহসা পশ্চাৎ ও সম্মুখ ভাগ আক্রমণ করতঃ যুদ্ধ জয় করিবে, কোথায়ও ব পার্শ্ব আক্রমণেই যুদ্ধের পরিণাম স্থিরীকৃত হইবে এবং কোন ক্ষেত্রে বা শত্রুর যুদ্ধরেখার উভয় সীমাস্থ সৈন্যকে ঘোরতর যুদ্ধে ব্যস্ত রাখিয়া তাহার ঈষৎ দুর্ব্বল কেন্দ্র ভেদের উপরই যুদ্ধের শেষ ফল নির্ভর করে। আততায়ীর এই সকল কৌশল চতুর আত্মরক্ষী একটু া করিলে সহজেই বুঝিতেপারে, চরদলের সহায়তায়, বন্দী ব্যোমযান ও পরিদর্শনমঞ্চ প্রভৃতির সাহায্যে এবং যুদ্ধের গতি দর্শনে রণনীতিজ্ঞ সেনানীর পক্ষে তাহা উপলব্ধি করা কঠিন হয় না। কিন্তু যাহাতে আত্মরক্ষী তাহা বুঝিতে না পারে তজ্জন্য আততায়ী সুকৌশলে তাহার দৃষ্টিবিক্ষেপ ঘটায় (feints or demonstrations)। যে ক্ষেত্রে পশ্চাৎ আক্রমণের দ্বারা জয়-লক্ষ্মী করায়ত্ব করা হইবে সে স্থলে আততায়ী হয়ত শত্রুর বাম সীমায় সৈন্য অস্ত্র ও রণোপকরণ সঞ্চিত করিয়া এরূপ ভীষণ ভাবে আক্রমণ আরম্ভ করিল, যে শত্রু ভাবিল তবে বুঝি যুদ্ধের চরম লীলা এই পার্শ্বেই হইবে। প্রতারিত শত্রু তাহার ব্যূহের অন্যান্য অংশ হইতে উদ্বৃত বল সংগ্রহ করতঃ বাম পার্শ্ব রক্ষায়

মনোনিবেশ করিল, ফলে তাহার পশ্চাৎ ভাগ, দক্ষিন পার্শ্ব ও কেন্দ্র অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। এদিকে কৌশলী আততায়ী হয়ত একদল দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য এ যাবৎ গুপ্ত রাখিয়া যথা সময়ে অতিদূর পথে যুদ্ধমান শত্রুর পশ্চাৎভাগে প্রেরণ করিয়াছে। সেই গুপ্ত সৈন্যদল অতি সংগোপনে অগ্রসর হইয়া শত্রুর দুই ক্রোশ স্থিত প্রায় অরক্ষিত দুর্ব্বল পশ্চাৎ ভাগ ভীম বলে আক্রমণ করিল। এই আক্রমণ ফলে সমস্ত যুদ্ধ রেখা বিচলিত হইবেই হইবে; বিপন্ন শত্রু সংযোজক পথ রসদ অস্ত্র লুণ্ঠন ও পরাজয়ের ভয়ে সম্মুখে অতি ক্ষীণ সেনা রেখা রাখিয়া যথাসম্ভব সমস্ত বল তদভিমুখে অপসারিত করিতে থাকে। উৎসুক শ্যেনদৃষ্টি আততায়ী বিচলিত যুদ্ধরেখার এই ক্রমশঃ ক্ষয় লক্ষ্য করিয়া ক্রমে দক্ষিন পার্শ্ব হইতে কেন্দ্র এবং কেন্দ্র হইতে বাম দিকে দ্বিগুন বলে যুদ্ধ আরম্ভ করে। শত্রুর ক্ষীণ রেখা অচিরাৎ ভগ্ন ও বিতাড়িত হইয়া দ্রুত পশ্চাৎপদ হইতে থাকে। জয়োল্লসিত অততায়ী রেখার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্ব শত্রুকে বেষ্টন করতঃ অগ্রসর হইতে হইতে পূর্ব্বোক্ত পশ্চাৎ আক্রণকারী সেনার সহিত দুই দিক হইতে মিলিত হইয়া পরাজিত শত্রুকে জালের মধ্যে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া ফেলে। রুষ জাপান সমরের মুকডেন যুদ্ধে ঠিক এই ভাবে জাপাণীগণ বাম পার্শ্ব আক্রমনের দ্বারা রুষ সেনার দৃষ্টিক্ষেপ সংঘটন করতঃ পশ্চাৎ ভাগ আক্রমণ করিয়াছিল এবং কিউরোপাটকিনের মহতি সেনা বেষ্টন করতঃ অর্দ্ধলক্ষ সৈন্য বন্দী ও হতাহত করিয়াছিল।

ক্ষেত্রনীতিতে যেমন সেনাপতি স্বকীয় নিখিল বল বহু খণ্ডে

বিভাগ করতঃ নানা দিক হইতে একে একে সম্মিলিত করিতে করিতে অবশেষে যাইয়া চরম লক্ষ্যে দশদিক হইতে মুহুর্মুহু আঘাত করে, সমর ক্রীয়াকৌশলেও এই পরিবেষ্টন পদ্ধতির মূলে সেই বহুমুখী আক্রমণনীতি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। একটি সুদৃঢ় শত্রুব্যূহ ভগ্ন বা করায়ত্ব করিতে হইলে সেই লক্ষ্যে যত অধিক বিভিন্ন আঘাত বিভিন্ন দিক হইতে করা যায়, ততই তাহার সিদ্ধি সহজ হইয়া আসে। মুকডেনের যুদ্ধে কিউরোপাটকিনের মহতী সেনা সপ্ত জাপানী রথীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও হয় নাই, ধূর্ত্ত রুষ সেনাপতি আসন্ন বিপদ বুঝিয়া বহু সৈন্য নির্গমনপথে কেন্দ্রীকৃত করতঃ তাহা ঈষৎ উন্মুক্ত রাখিয়া ছিলেন। এই জন্য কিউরো-পাটকিনের চার পাঁচ লক্ষ সৈন্যের অধিকাংশই পলায়নে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ব্যূহ বহির্গত হইবার সময়ে এই সঙ্কুচিত মার্গে (narrow mouth of a tupe) বাহির হইবায় সময়ে বিজয়োন্মত্ত রণদুর্দ্ধর্ষ জাপানী সেনার হস্তে প্রহারর্জ্জরিত ও ক্ষয়িত-শক্তি হইয়া পড়িয়াছিল। "The simultaneous march of two or three armies upon one odjective, and not puufriqu-ently the failure to realise what a paralysing effect such a simultaneous convergent advance may some-times have upon a defending force, is a great stum-bling block to tne study of a empaingu. This is what is called the two moves to one capacity." নানা দিক হইতে যুগপৎ আপতিত অক্ষৌহিনী নিচয়ের আক্রমণের এক ভীতিউৎপাদিকা শক্তি আছে,; শত্রুর প্রত্যেক আঘাত-কৌশল দুই তিনটি চতুর প্রতিপ্রহারে ব্যর্থ করিবার ক্ষমতাই

উৎকৃষ্ট নেতার লক্ষণ। এখন বিচার্য্য এই যে সম্মুখ আক্রমণেই হউক বা পার্ষ্ণীগ্রাসে বা পশ্চাদাক্রমণেই হউক কোন্ কোন্ উপায়ে প্রকৃত যুদ্ধ ব্যাপারটি সংঘটিত হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—————:*:—————

অশ্বসাদীর ক্ষেত্রনীতি—নৈশ আক্রমণ।

পদাতিকই যুদ্ধ কাণ্ডে আক্রমণের প্রকৃত উপকরণ, এবং কামান শ্রেণী আক্রমণের প্রারম্ভে, তৎকালে ও অন্তিমে পদাতিক অনীকিনীর সহায় মাত্র। তবে অশ্বারোহী কি? রণনীতির প্রথম খণ্ডে সেনার পরিচয় দিবার সময়ে ইহার কতক আভাষ দেওয়া হইয়াছে,—অশ্বসাদী সেনাও প্রকৃত মুখ্য যুদ্ধোপকরণ নহে, ইহা যুদ্ধ্যমান পদাতিকের সহায় মাত্র। অশ্বারোহীকে বাছিয়া বাছিয়া মারা বড় সহজ, ৩৫০ গজ দূর হইতে ৮০০ রাইফেলধারী একবার মাত্র গুলিধারা (volley) বর্ষণ করিয়া ৪২৪ জন অশ্বারোহীকে ধরাশায়ী করিতে পারে। সুতরাং অশ্বারোহীদলকে অধিকাংশ সময়ে রাইফেল হইতে ৩৮৫০ গজ দূরে থাকিতে হয়। এই জন্য সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া ইহারা যুদ্ধের প্রকৃত আক্রমণ ব্যাপারের ভার লইতে পারে না। অশ্বারোহীকে সুতরাং মুখ্য যুদ্ধশীল পদাতিক সেনার সহায়তার ভার লইতে হয়। এই কর্ত্তব্য প্রধানতঃ চতুর্ব্বিধ,—অশ্বারোহী চরসৈন্যের কার্য্য করিবে, অশ্বারোহী প্রত্যেক পদাতিক দলের সহিত প্রত্যাসার সৈন্যরূপে (reserve) থাকিবে, অশ্বারোহী পার্ষ্ণির সৈন্যরূপে স্বপক্ষীয় অক্ষৌহিনী বা অনীকিনীর পৃষ্ঠ রক্ষা করিবে, এবং অশ্বসাদী অবসর বুঝিলে সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে

আততায়ীর মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া পরাজিতপ্রায় শত্রুর বিপর্য্যয় সাধন সম্পূর্ণ করিবে।

অশ্বারোহী সৈন্য অতি দূর হইতেই সহজে দৃষ্টিগোচর হয়, এই জন্য শত্রুর নিতান্ত সন্নিধানে যাইয়া তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ লইতে অশ্বারোহী সমর্থ নহে। চরসৈন্যের কার্য্য করিতে যাইয়া অশ্বসাদী বিপক্ষের অবস্থিতি ভূমি, ব্যাপ্তি, দৈর্ঘ্য ও মোটামুটি বলাবল কতক পরিমাণে নির্ণয় করিবে। বিশাল দেশ আক্রমণ করিবার মানসে যখন আততায়ী সেনা সেই দেশের প্রান্তখণ্ডে প্রবেশ করিতেছে, তখন আততায়ী পক্ষে সওয়ার শিপাহী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া সেই অজ্ঞাত অপরিচিত দেশের শত্রু ছাউনী প্রভৃতির সম্বাদ গ্রহণ করিবে, শত্রুর রসদ বারুদ লুটিয়া গুপ্ত সেনারূপে রহিয়া বিক্ষিপ্ত বিপক্ষ সৈন্যকে ইতস্ততঃ আক্রমণ করতঃ শত্রুকে ভীত করিয়া তুলিবে। ফ্রান্স ও জার্ম্মানীতে অশ্বসাদীর লক্ষ্যনৈপুণ্য (correct shooting) বিষয়ে সামরিক বিভাগে বড় যত্ন লয় না। শান্তির সময়ে অশ্বসাদীর বন্দুক চালনা অভ্যাস মাত্র ২০০।২৫০ কার্ত্তুজ দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ইংরাজ সৈন্যের অশ্বসাদীর লক্ষ্যাভ্যাস জন্য বাৎসরিক ৩০০ কার্ত্তুজের এবং মার্কিন সৈন্যে ৪০০ কার্ত্তুজের ব্যবস্থা আছে। চঞ্চল দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে রহিয়া লক্ষ্য ঠিক হয় না, অশ্বারোহীকে প্রকৃত যুদ্ধলীলায় ব্যাপৃত হইতে হয় না, এবং দ্রুতগমন ও ক্ষিপ্রকারিতার জন্য সদা প্রস্তুত থাকিতে হয় বলিয়া অশ্বারোহীর লক্ষ্যনৈপুণ্যের এত অনাদর। আজ কাল অশ্বসাদীকে যুদ্ধোপযোগী করিবার জন্য পদাতিকের ব্যূহাভ্যাস অস্ত্রব্যবহার প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে অশ্বারূঢ় পদাতিকে পরিণত করা হইয়াছে। অশ্বারোহী সেনার সহিত

তরবারি, বল্লম, সঙ্গীন ও লঘু ক্যারাবিন বন্দুক থাকে। কিন্তু আজ কাল বল্লমের ব্যবহার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

বিশাল সেনা অক্ষৌহিনী, অনীকিনী, বাহিনী, পৃথনা, চমূ গুল্ম প্রভৃতি যত প্রকার দলে বিভক্ত হয়, তাহার প্রত্যেকটীর সহিত এক এক দল অশ্বারোহী প্রত্যাসার সৈন্যরূপে থাকা একান্ত আবশ্যক। আপদে বিপদে দ্রুতগামী অশ্বসাদী যেরূপ সহায়, শত্রুর সন্তর্পনে গুপ্ত আগমন পূর্ব্বাহ্নে লক্ষ্য করিতে সদা চঞ্চল অশ্বসাদী যেরূপ দক্ষ সেরূপ আর কেহ নহে। সেই হেতু তথ্য গ্রহণ, অলক্ষ্য আক্রমণ নিবারণ, জালবৎ পরিবেষ্টন ও শত্রুকে উত্যক্ত করিবার জন্য অশ্বসাদী দল প্রত্যাসার সৈন্যরূপে সকল সেনাদলের সহিতই থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। "In these days of long range fire-arms it is imperatively necessary to attach some cavalry, if only a few men, to each body of infantry, in order to protect the latter from being surprised by fire." "আজ কাল এই দূরক্ষেপী মারাত্মক অস্ত্রের দিনে প্রত্যেক স্বাধীন সৈন্যদলের সহিত প্রত্যাসার অশ্বসাদী থাকিলে সেনাকে কূটবুদ্ধি শত্রুর সহসা-আক্রমণ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিতে পারে।" এই প্রত্যাসার অশ্বারোহী সেনার কতকাংশ গুল্মসেনারূপে বহু ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া স্বপক্ষীয় ব্যূহ বা গতিশীল সেনার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া এক যবনিকার সৃষ্টি করে, কতকাংশ আক্রমণে রত সেনার পশ্চাতে অন্তরালে রহিয়া তাহার পার্শ্বদ্বয় রক্ষা করে, এবং অবশিষ্ট অংশ সকলের পশ্চাতে রহিয়া স্বপক্ষীয় সেনার পৃষ্ঠ ও সংযোজক পথ সুরক্ষিত রাখে।

অগ্রগামী চরদল, পার্শ্বরক্ষী প্রত্যাসার ও সুচতুর অশ্বসাদীর

কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে অশ্বারোহীকে দ্রুতগামিতা, রণ-পটুতা, অশ্বারোহণ দক্ষতা, দুঃসাহস ও অতিশয় কষ্টসহিষ্ণুতা শিক্ষা করিতে হয়। ইউরোপে রুষ কসাক অশ্বারোহী এবং এসিয়া খণ্ডে শিখ অশ্বসাদীই শ্রেষ্ঠ। কসাক সৈন্যের শিক্ষা পদ্ধতি কতকটা অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিসুলভ—" The squadron system is adopted, the captain in command being entirely responsible for efficiency of men and horses To it is attributable the capacity of self reliance of the officers. The actual training of the Cossack cavalry is in orthodox cavalry fashion, the aim being to evolve a supple body with power to manœuvre for the utmost advantage Individual training pays special attention to indipendent reconnaissance, horsemanship and knowledge of the mount "

"সেই জন্য আজ কাল অশ্বারোহী সেনার এক একটি বাহিনী এক এক জন বাহিনীপতি বা কাপ্তেনের অধীনে কার্য্য করে, নিজ নিজ সৈন্যের উৎকর্ষ্য সাধনের দায়ীত্ব এই বাহিনীপতিগণের উপর ন্যস্ত থাকে। কি অশ্বারোহণে এবং কি পাদচারে বিদ্যুদ্গতিতে আক্রমণ প্রত্যাহরণ ও পরিভ্রমণে পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য এই অশ্বসাদী সেনাকে লুণ্ঠনজীবী দুঃসাহসী দুর্ব্বার তাতার অশ্বারোহীর পদ্ধতিতে শিক্ষা দান ও চালনা করা হয়।"

অশ্বারোহী যুদ্ধের মুখ্য আক্রমণকাণ্ডে যোগ না দিলেও কখন কখন অনুকূল অবসর পাইলে তাহাদিগকেও শত্রুনাশার্থে সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইতে হয়। যখন পুনঃ পুনঃ আক্রমণে, পার্শ্ব ও

পৃষ্ঠভেদে এবং প্রতিপ্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া শত্রুসেনা পরাজিত-প্রায় হয়, তখন তাহার সেই বিপর্য্যয় সম্পূর্ণ করিবার জন্য কখন কখন ঘনবদ্ধ বহুসহস্র অশ্বারোহীর দুর্ব্বার আক্রমণ আবশ্যক হয়। বুয়ার সমরে একবার খাতান্তর্গত ব্যূহবিন্যস্ত বুয়ারকে আক্রমণ করিবার জন্য সেনাপতি গর্ডন ও ব্রডউড ছয় সহস্র অশ্বারোহী লইয়া ঝড়বেগে অগ্রসর হইয়াছিলেন। "Gordon and Broadwood's brigades 6000 horses in all charged in a dense cloud of smoke. The impression caused by the dashing mass of horsemen was such that some of thee Boers took to flight before the cavalry had approached within effective rifle range. Those of the enemy who held their ground, fired for the most part too high in their excitement. Dust cloud offered no larget, and tha fire from the English guns were such that the Boers were scarcely able to shoot at all at the advancing army." "ব্রডউড ও গর্ডনের ছয় সহস্র অশ্বারোহী ঘনবদ্ধ রেখায় ধূলার পুঞ্জ মেঘ তুলিয়া ছুটিল। এই উত্তাল প্রবাহের ভীমবেগ-দর্শনে ভীত, আতঙ্কিত বুয়ারদল সে প্রবাহ নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতে পলায়নপর হইল। যে বুয়ারগণ সাহসে ভর করিয়া স্বস্থানে অটল ছিল, তাহারা অতিমাত্র উত্তেজনা বশে লক্ষ্যের এত উচ্চে বন্দুক চালনা করিল যে তাহা আততায়ীর সৈন্যদলকে স্পর্শও করিল না। বিশেষতঃ ধূলার পুঞ্জীভূত মেঘের আবরণ হেতু ধাবমান শত্রুর প্রতি অধিকাংশ বুয়ার লক্ষ্যই করিতে পারিল না।"

কিন্তু এরূপ অশ্বারোহীর আক্রমণ আজ কালের সমরনীতির বিরোধী ; অবস্থা বিশেষে কার্য্যকরী হইলেও ইহার জন্য শুভ অবসর নির্ব্বাচন বড় কঠিন কার্য্য,অতিশয় সুদক্ষ সমরজ্ঞ সেনাপতি না হইলে অবসর বুঝিয়া ইহা সুসম্পন্ন করিতে অন্য কেহ পারে না। চরসৈন্যের কার্য্য বা প্রত্যাসার সেনারূপে স্বকর্ত্তব্য সাধন করিবার সময়েও অশ্বারোহীকে অল্পবিস্তর যুদ্ধ করিতে হয়। চরবৃত্তি করিতে যাইয়া মৌল সেনার (main army) পুরোগামী অশ্বারোহী গুল্ম (Cavalry out posts) শত্রুর দেশে বা শত্রুর যুদ্ধভূমে (theatre of war) যাইয়া তাহাদিগের রেল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন্ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাউনী গুলি ধ্বংস করিয়া প্রতিপক্ষের পশ্চাদ্বর্ত্তী নিরাপদ সংযোজক পথ ভগ্ন ও বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া তোলে। তাহাদিগের রসদ বা অস্ত্র যে যে স্থানে সঞ্চিত আছে, বা যে যে পথে চলিতেছে তথায় সহসা আবির্ভূত হইয়া অশ্বারোহী গুল্মসৈন্য তাহা লুণ্ঠন বা অগ্নিসাৎ করিয়া শত্রুকে নির্জীব ও বিপন্ন করিয়া ফেলে। যুদ্ধশীল বাহিনী বা অনীকিনীর পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রত্যাসার অশ্বারোহীর (reserve cavalry) কর্ত্তব্য এই যে, যখন শত্রু পরাজিতপ্রায় ও ক্ষয়িতশক্তি হইয়া পড়িয়াছে তখন ইহারা ঝড়বেগে তাহার উপর যাইয়া পড়িবে, এবং অসি ও সঙ্গীনের আঘাতে পলায়মান শত্রুকে ধ্বংস বা আত্মসমর্পণে বাধ্য করিবে। আজ কাল অস্ত্রের দূরগতি হেতু যুদ্ধক্ষেত্র বিশাল আকার ধারণ করিয়াছে, তজ্জন্য শত্রুর দীর্ঘ রেখা বা ব্যূহের একাংশ বিশৃঙ্খল হইলেও তখনও তাহার নানা স্থান অক্ষত ও অক্ষুণ্ণবল থাকে। প্রত্যাসার অশ্বারোহী শ্রেণীর কর্ত্তব্য তখন পরাজিতপ্রায় শত্রুকে আশ পাশ হইতে বলসঞ্চয়ে বাধা

প্রদান্ করা ; দ্রুতগামী বেগশালী অশ্বারোহী এই বহুবিস্তৃত নানা অক্ষত দলকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রাখিয়া নির্য্যাতিত করিবে, এবং বিভক্ত শত্রুকে অধিকতর বিভক্ত করিয়া দুর্ব্বল করিয়া রাখিবে। অল্প কথায় বলিতে গেলে ইহাই অশ্বসাদীর ক্ষেত্রনীতি ও সমর-ক্রীয়াকৌশল। আক্রমণ কাণ্ডে অশ্বারোহীর স্থান কোথায়! এখন পাঠক তাহা বুঝিলেন।

কামান ও তুরঙ্গসাদী সৈন্য খনক ও যন্ত্রক, গূঢ়চর ও প্রত্যাসার প্রভৃতি মৌল সেনার সহায় হইলেও দুরগতি রাইফেল মুখে আক্রমণ ব্যাপার বড় ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। মৃত্যু সংখ্যার (casualty) অতিমাত্র বৃদ্ধি এড়াইবার জন্য তাই আততায়ী দলের রেখাবিস্তার (deployment), আশ্রয়ের অন্ত-রালে অন্তরালে রহিয়া রহিয়া প্রধাবন (charge by rushes), আত্মগুপ্তি ও আক্রমণকাণ্ডের আকস্মিকতা (element of sur-prise) এবং সংবেষ্টনে শত্রুর চিত্তবিক্ষেপ সংঘটন (fients) প্রভৃতি কৌশলের অবতারণা হইয়াছে। এত সাবধান হইয়াও সকল সময়ে আততায়ী রেখা অগ্রগামী হইতে পারে না, অনেক ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব অগ্রসর হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে এবং অব-শেষে নিশার অন্ধকারে খাত পরিখা স্তূপরাজি রচনা করিতে করিতে সম্মুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু যন্ত্রজ বিদ্যুতালোকের (search light) তাড়নায় আজ কাল রাত্রের অন্ধকারে অগ্রগমন ও কঠিন করিয়া তুলিতেছে। তমান্ধ নিশিথিনীতে উভয় ব্যূহবদ্ধ সেনাই গুপ্ত যন্ত্রজ আলোকসম্পাতে পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান ভূমি সদা উদ্ভাসিত ও আলোকিত রাখে। ক্ষণে ক্ষণে তারাক্ষেপী বোমা (star shell) নভোদেশে উঠিয়া সহস্র

নক্ষত্র পুঞ্জের সৃষ্টি করতঃ ঝরিতে ঝরিতে রণক্ষেত্র উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। এই জন্য জাপানীগণ বায়ুর গতি বুঝিয়া কোন গ্রামে অগ্নি সংযোগ করতঃ বায়ু দ্বারা শত্রুর সম্মুখে বা ব্যবধান-ভূমিতে সঞ্চালিত সেই পুঞ্জ পুঞ্জ ধূমের আশ্রয়ে বিদ্যুদ্বেগে অগ্রসর হইয়া রুষ সৈন্য পরাজিত করিত। অনেক সময়ে এত চেষ্টা ও কৌশল করিয়াও দৃঢ়ব্যূহ শক্তিশালী বিপক্ষকে কিছুতেই দিবাভাগে আক্রমণ করা যায় না, তখন নৈশ আক্রমণ করিবে এবং শত্রুব্যূহ হইতে দশ পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে আসিয়া আর দিবাভাগে পথ চলিবে না; এখনও এই নিয়মের উপযোগিতা অক্ষুণ্ণ আছে। নৈশআক্রমণের জন্য রাত্রে পথ চলিতে হয়, কিন্তু তাহাতে আক্রমণের মাহেন্দ্র ক্ষণ পথেই অতীত হইয়া যাইতে পারে, কারণ দিনের আলোকে অতি দুর্গম পথও সরল বোধ হয়, কিন্তু রাত্রে সামান্য প্রস্তরবাহুল্য বা অরণ্যখাতস্তূপই দুরতিক্রম্য দুরারোহ বাধা বলিয়া বোধ হয়, এবং অন্ধকারে সেই সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিতে এত বিলম্ব ঘটিয়া যায় যে, নৈশ আক্রমণের শুভযোগ ও নির্দিষ্ট সময়ে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার নিশ্চয়তা থাকে না। রণনীতি লেখক কল্‌ভিল্ (G. Colville) বলেন যে, নৈশ আক্রমণের জন্য যাত্রা করিতে হইলে অতি প্রত্যূষে কুচ করিতে আরম্ভ করিয়া ১৪ মাইল পথ অতিবাহিত করিবে, এবং আক্রমণের ক্ষেত্রের সন্নিকটে নিয়তম স্থানে বিশ্রাম করতঃ নৈশান্ধকারে অবশিষ্ট পথ নিঃশেষ করিবে। কিন্তু রাত্রে রণক্ষেত্র অভিমুখে ব্যূহবদ্ধ শত্রুর প্রতি অন্ধকারে অভিযান করিতে অতিশয় সাবধানতা প্রয়োজন।

"If such alarm (as at Tel-el-kebir) can take place

during the bivouac before a nightmarch, what panics are not possible during the march itself, when each soldier feels that every moment is bringing him closer to an enemy who, for all he knows, for all his leaders may know, is thoroughly on the alert, and may at any instant crumble up the attack by a charge of cavalry, or by suddenly opening fire from a long line of guns." "তেল এল্ কেবিরের নৈশ ছাউনীতে একবার "ঐ শত্রু, ঐ শত্রু" এই মিথ্যারব উঠিয়া সমস্ত সৈন্যকে পলায়নপর ও বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছিল। নৈশ ছাউনীতেই যদি এই প্রকার অমূলক ভীতি সম্ভব হয়, তাহা হইলে নৈশ আক্রমণে তাহার কত অধিক সম্ভাবনা আছে তাহা সহজেই অনুমেয়; কারণ আততায়ী সেনার সদা এই এক দুশ্চিন্তা থাকে যে, হয়ত স্বপক্ষের চরগণের আনীত সংবাদ যথার্থ নহে, হয়ত সতর্ক শত্রু অন্ধকারে কোথায় সহসা অশ্বারোহী প্রধাবনে বা দুর্ব্বার অগ্নি-ক্রীড়া করিয়া তাহাদের ধ্বংস সাধনের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে।" এই ভীতি ও আশঙ্কা নৈশ যুদ্ধের নিঃশব্দগতি আততায়ী সেনাকে সদা সন্দেহ দোলায় দোলায়মান রাখে। অবশ্য আপন দক্ষ সেনাপতির প্রতি পূর্ণ আস্থাবান হইলে সেনাকে এরূপ কোন অমূলক আশঙ্কা আতঙ্কিত করিতে পারে না। অনেক সময়ে নৈশ আক্রমণের পূর্ব্ব দিন দিবাভাগে একবার শত্রুকে দুর্ব্বার আক্রমণে ঘোরতর যুদ্ধে বিপর্য্যস্ত অন্ততঃ কতকটা বিমর্দ্দিত করিয়া লইতে হয়; তাহার পর নূতন সঞ্চিত প্রত্যাসার সৈন্য লইয়া আবার গভীর রাত্রে আচম্বিতে শত্রুর উপর আপতিত

হইয়া রণরঙ্গে মাতিলে বিপক্ষ সে মুহুর্মুহু পরাক্রম প্রকাশ দর্শনে ভয়েই কাতর হইয়া পড়ে; যে আততায়ী কি দিবা কি রাত্র সকল সময়েই সশস্ত্র যুদ্ধোন্মুখ ও প্রহারপরায়ন, সে আততায়ীর সহিত আঁটিয়া উঠা বড় দুরূহ ব্যাপার। "First harass the enemy well and fight him in the day time and then a quick decided night attack will alarm him to the verge of panic, to find their restless enemies pressing on them during the hours of darkness."

কি দিবাভাগে যুদ্ধের পর এবং কি কেবল নৈশ আক্রমণে উভয় ক্ষেত্রেই অতি সতর্কতার সহিত আত্মগোপন করিয়া ব্যবধান ভূমি উত্তীর্ণ হইতে হয়, কারণ আক্রমণ অতর্কিত না হইলে নৈশ আক্রমণেকোন বিশেষ সুফল নাই। যে সৈন্য লইয়া বিপক্ষের ছাউনী বা বূ্যহ আক্রমণ করিতে হইবে তাহাকে প্রথমে কয়েকটি অংশে ভাগ করিয়া এক এক জন সুদক্ষ চতুর নেতার অধীনে কার্য্য করিতে দিতে হয়। এই নেতাগণের হস্তে অতিশয় শক্তিশালী দূরবীক্ষণ ও কোন জ্যোতিষ্মান পদার্থে প্রস্তুত দিগদর্শন যন্ত্র (a compass with a dial painted with luminous paint) থাকে; তাহার ও গুপ্তচরগণের সাহায্যে পথ দেখিয়া এই বিভিন্ন নেতা স্ব স্ব দলকে বিভিন্ন পথে একই লক্ষ্যাভিমুখে লইয়া চলে। পথে শত্রুর সন্নিকটে কোন এক পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে (point of assembly) সকলে মিলিত হইলে তখন প্রকৃত অভি-যান আরম্ভ হয়। প্রত্যেক সৈন্যের উপর এই কড়া হুকুম থাকে যে, কেহ যেন কোন শব্দ না করে, কোন আলোক না জ্বালে বা বন্দুক আওয়াজ না করে। এই জন্য অনেক সময়ে সৈন্যদিগকে

রাইফেল গাদিতে দেওয়া হয় না; এক জন সৈন্য অসাবধানতা বা কোন কারণ বশতঃ একটি বন্দুকের আওয়াজ করিলেই এত যত্নের অভিসন্ধি ত ব্যর্থ হয়ই, অধিকন্তু সমস্ত সেনা বিপন্ন বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে পারে। এই আক্রমণ সম্পূর্ণ অতর্কিত হইলে আর বড় রাইফেল কাওয়াজ করিতে হয় না, কেবল সঙ্গীন ও তরবারীতেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। যদি বা গুলি চালনার আবশ্যক হয়, তাহা হইলেও সে গুলি আক্রমণের অব্যাহতি পূর্ব্বেই নলে ভরিয়া লইতে হয়। নৈশ আক্রমণে জয়লাভ সম্যক তথ্য সংগ্রহের উপর নির্ভর করে: কারণ শত্রুর অতিশয় দুর্ব্বল ব্যূহাংশ আক্রমণ করিয়া বিপর্য্যস্ত করিলেই তবে তাহার প্রাণে ভীতির সঞ্চার হয়। অবশ্য আক্রমণ যত ব্যাপক ও যত নানাদিগ বিসর্পী হয় তত্তই শত্রুপরাজয় সহজসাধ্য হইয়া আসে। নৈশ আক্রমণই যুদ্ধ-কাণ্ডের ব্রহ্মাস্ত্র, এবং ইহা দুর্ব্বল অথচ ভীরু আত্মরক্ষীরই প্রধা-নতঃ আশ্রয়নীয়।

—:*:—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—————:*:—————

সেনানীই নিয়ন্তা—আত্মরক্ষীর নীতি

যুদ্ধভূমে চিরদিন সেনানীই অক্ষৌহিনী নিচয়ের নিয়ন্তা। তাঁহারই অঙ্গুলীর সঙ্কেতে সেনা অব্যর্থ অপ্রতিহত বেগে যুদ্ধ ভূমে আপতিত হইয়া অমোঘ বজ্রের ন্যায় কার্য্য করে। ঘোর যুদ্ধে অত্যল্প শক্তি ব্যয় করিয়া অত্যধিক সুফল লাভ করাই সেনানীর গুণের পরাকাষ্ঠা। যুদ্ধক্ষেত্র আ/ কাল প্রকৃতই মৃত্যুর কটাহ, মানবী জ্ঞান যতপ্রকার প্রাণনাশক অস্ত্র শস্ত্রের আবিষ্কার এ যাবৎ করিয়াছে, সে সকলই তথায় সৈন্যধ্বংসে স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। এই সকল অনলোদ্গারী সুভীষণ অস্ত্রের মুখে সৈন্য যথোপযুক্ত স্থানে রাখা বরং সহজ, কিন্তু চালনা করা বড় কঠিন কার্য্য। যখন আততায়ী শ্রেণীগুলি (Storming parties) আশ্রয়ের অন্তরাল ত্যাগ করতঃ বিপক্ষের প্রতি রাইফেল ও এমন কি কামান চালনা অবধি স্থগিত রাখিয়া প্রধাবিত হয়, তখন তাহাদিগকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করা অতিশয় দুরূহ কাণ্ড। বিশেষতঃ পদাতিক সৈন্যের নেতৃত্ব কঠিনতর ও বিপদসঙ্কুল; আজ কাল যদি ৩০০ জন দক্ষ গোলন্দাজ বা অশ্বারোহী সেনানী মিলে, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে ১০০ জন মাত্রও চতুর পদাতিক সেনানী পাওয়া

দুর্লভ হয়। প্রত্যেক বাহিনীতে কিন্তু সেই ১২।১৫ শত সৈন্যকে সংযত রাখিয়া চালনা করিবার জন্য অন্ততঃ পক্ষে পঞ্চাশ জন উপযুক্ত সেনানী আবশ্যক। যে সকল নিরক্ষর কৃষি-জীবী জাতি হইতে সৈন্য নিযুক্ত করা হয়, তাহারা প্রায়ই স্বভাবতঃ নিতান্ত নির্ভরশীল। নেতা না থাকিলে, অতি উৎকৃষ্ট সৈন্যও অনেক সময়ে ভীত অশিক্ষিত জনসঙ্ঘের ন্যায় কার্য্য করে, তাহাদের রণপটুতা সাহস বীর্য্য সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বীরোচিত ঐশ্বর্য্য কোন ব্যবহারেই আসে না। এদিকে চতুর শত্রু অব্যর্থ-সন্ধানী সেনার প্রয়োগে বাছিয়া বাছিয়া সেনানী মারিয়া ফেলে; সুতরাং যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত সেনানী না থাকিলে যুদ্ধে পরাজয় প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। "There have been cases when all the officers being killed, the troops appealed to the officers of the Red Cross detachments to take the command, because they would be left alone without permission to attack the enemy." "অনেক সময়ে মেষ-স্বভাব রুষ সৈন্যগণ ভীষণ যুদ্ধে স্ব-বাহিনীর সমস্ত সেনানী হারাইয়া রেড-ক্রস নামক শুশ্রূষকদলের নেতাগণকে তাহাদিগের নেতৃত্ব ভার লইতে অনুরোধ করিয়াছে, কারণ তাহারা নেতার অভাবে শত্রুকে আক্রমণ করিবার আদেশ পাইতেছে না।" ভারতবর্ষের প্রায় সকল নিরক্ষর যুদ্ধজীবী জাতিই এমনই পরাবলম্বী ও নেতার উপর নির্ভরশীল"। ইহারা প্রকৃত নেতার আদেশ পাইলে অসাধ্য সাধন করিতে পারে, কিন্তু "নেতৃহীন হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পলায়নপর হয় বা দাঁড়াইয়া অনর্থক জীবন বিসর্জ্জন করিতে থাকে।"

নালিকাস্ফুরকভীমা রণরঙ্গিনী শক্তির বাহু পূর্ণাঙ্গ সেনা ও মেধাধাররূপী শির তাহার সেনানীগণ। আজকাল সেনানীর দুই প্রকার ভেদ আছে যথা প্রধান সেনাপতি ও তাঁহার সমরসচীব বা মন্ত্রীদল (Commander-in-chief and war-ministers) এবং নানা সৈন্যদলের অধিনায়কগণ। প্রথম দল প্রকৃত সেনার কার্য্য করে, যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে থাকিয়া সমগ্র সমর-লীলার পূর্ব্ব-কল্পিত অভিসন্ধি (Strategy) ও ক্ষেত্রনীতি (tactics) স্থির করে ; এবং দ্বিতীয় দল যুদ্ধক্ষেত্রে রণনিরত সেনার সহিত রহিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট অভিসন্ধি ও ক্ষেত্রনীতির সাধনার ভার গ্রহণ করে। কোন কোন বিরাট যুদ্ধের সমাপ্তির সন্ধি-ক্ষণে সেনাপতিও স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করেন বটে, কিন্তু তাহাও সচরাচর অন্তরাল হইতে। সেনাপতি বা সেনা-নীর কি কি গুণ থাকিলে সেনা সর্ব্বদা জয়শ্রীসমন্বিত হবে তাহা এখন বিচার্য্য। সেনানীর প্রথম গুণ তাহার অমিত সাহস ও মৃত্যুভয়হীনতা ; জগতের নিয়মই এই যে আমরা অপরের নিকট যে মহত্ত্ব প্রত্যাশা করি তাহা স্বয়ং দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া অপরের মধ্যে উদ্রিক্ত করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সিপাহি বিদ্রোহের নেতাদিগের নিন্দা করিয়া জেনা-রেল ষ্ট্রং বলিয়াছিলেন, "তাদের মধ্যে যা'রা নেতা হ'য়েছিল, সেগুলো অনেক পিছন থেকে "মারো বাহাদুর" "লড়ো বাহা-দুর" ব'লে চিৎকার কর'তো ; আফিসার এগিয়ে মৃত্যু মুখে না গেলে কি সিপাহী লড়ে ? "সিরদার ত সরদার," মাথা দিতে পার ত নেতা হবে।" কিন্তু সেই সাহসের সহিত যদি উত্তে-জনা বশে বিবেচনা বুদ্ধি লোপ পাইল, যদি সাহস দুঃসাহসে

পরিণত হইল, তাহা হইলে সেনাপতির শিক্ষা পূর্ণ হয় নাই বুঝিতে হইবে। যাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতি, ধীশক্তি, ও রণপটুতার উপর লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন ও কর্ম্মসিদ্ধি নির্ভর করিতেছে, তাঁহার ধৈর্য্য অসীম হইবে ; তাঁহার অটল প্রতিজ্ঞা ও দুর্জ্জয় সাহস সকল সময়ে অনাবশ্যক হঠকারিতা বা অনর্থক দুঃসাহসে ব্যক্ত হইবে না, তাঁহার সাহসে বীর্য্যে তাঁহাকে ধীর করিবে, মৃত্যুভয়বিরহিত, বিবেচক ও কূটবুদ্ধি করিবে এবং সর্ব্বোপরি তাঁহাকে প্রত্যুৎপন্নমতি দান করিবে। পলকের মধ্যে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা, মুহূর্ত্তে ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিয়া অতিশয় বিপজ্জনক কার্য্যভার সাহস পূর্ব্বক লইয়া তাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করাই প্রকৃত নেতার কার্য্য। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পন্থা বা কার্য্যকৌশল এত জটিল ও দুঃসাধ্য হইবে, এরূপ বিরাট ব্যাপক ও সাহসব্যঞ্জক হইবে, যে সাধারণ মেধা বা বীর্য্য তাহা কল্পনা করিতেও ভীত হয়। শত্রু হয়ত পদে পদে জয়লাভ করিতেছে, পুনঃ পুনঃ তাঁহার মন্ত্রভেদ করতঃ তাঁহাকে খিন্ন করিতেছে, তথাপি সেনানী অসীম ধৈর্য্যের সহিত সে সকল বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া নিজ সিদ্ধির শুভক্ষণ আনয়ন করিবেন। বিরাট অক্ষৌহিনী-নেতা সেনাপতি সদা প্রফুল্ল, প্রসন্নচিত্ত ও অনুচরে করুণাস্নেহ-পরতন্ত্র হইবেন। তাঁহার আসন উচ্চে হইলেও তিনি যেন সামান্য সৈন্যেরও নিকট দুরধিগম্য ভয়ের বস্তু না হন। সেনাপত্য ও রাজ্যপাট একই কথা, লোকরঞ্জক রাজার অনন্ত গুণ সেনাপতিরও আবশ্যক। হয়ত আপন সৈন্য বার বার পরাজিত লাঞ্ছিত হইতেছে, তথাপি, সেনানী ধৈর্য্যশীল হইয়া সর্ব্বদা সৈন্যগণকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত

করিবেন, সেই ঘোর পরাজয়েও ধীরের বীরত্বের পুরস্কার দিয়া. ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, বীররসাত্মক বাণী শুনাইয়া এবং আবশ্যকমত স্বয়ং দুঃসাহস দেখাইয়া সমস্ত সেনাকে অমিত-তেজ ও অক্ষুণ্নবীর্য্য রাখিবেন। সেনাপতির চরিত্র দেবোপম বিমল অকলঙ্ক হইবে; পাপের আধারে সাহস বীর্য্য ধর্ম্মজ্ঞান জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়ে, সেনাপতি দৈবী শক্তির আধার সুতরাং তাঁহার মনমন্দির যেন পূত সচন্দন পুষ্পিত পুণ্যগঙ্গোদকসিক্ত থাকে, সে মন মন্দিরে যেন ভগবানের লিঙ্গ সদা জাগ্রত রহে। যে দিন হইতে রুষজাপান সমর আরম্ভ হয়, সেই দিন হইতে প্রত্যহ সেণ্টপিটার্সবার্গ সামরিক কার্যালয়ে জাপান হইতে অসংখ্য অগণ্য পেটিকা ডাকযোগে প্রেরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। পাঠক, এ সকল পেটিকায় কি বস্তু ছিল তাহা জান কি? যে সকল রুষ সৈন্য বা সেনানী যুদ্ধে হতাহত বা বন্দী হইত তাহাদিগের পকেটে যাহা কিছু পাওয়া যাইত তৎসমস্তই এইরূপে রুষে প্রেরিত হইত। যুদ্ধক্ষেত্রে সামান্য সৈন্য হইতে সেনানী পর্য্যন্ত যে কেহ যাহা কুড়াইয়া পাইত তাহাই রুষ গবর্ণমেণ্ট জাপানের নিকট হইতে ফিরিয়া পাইতেন। কোন হত রুষ সৈন্যের পকেটে হয়ত কয়েকটি রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রা ছিল, কাহারও অঙ্গে হয়ত বহুমূল্য অঙ্গুরীয় ও স্বর্ণঘড়ি ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে কখনও কপর্দ্দকও অপহৃত হয় নাই। অবশ্য তমাচারী ইউরোপীয় রাজশক্তি রুষগবর্ণমেণ্ট এ অপূর্ব্ব সাধুতার কখন প্রতিদান করেন নাই, জাপানী সেনার যাহা কিছু পাইয়াছেন নির্ব্বিবাদে আত্মসাৎ করিয়াছেন। শিবাজী-রাণা তাঁহার বীর শত্রুকে কিরূপে সম্মানিত করিতেন তাহা আজ ইতিহাস কথার

পরিণত হইয়াছে। ভারতের কি হিন্দু কি মুসলমান সকল বীরগণই দেববাঞ্ছিতগুণে ভূষিত ছিলেন। শূদ্র ভারতকে আবার ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিতে হইলে আবার মহদাশয় ও বহু গুণশালী হইতে হইবে।

সেনাপতির রণপটুতার সহিত মন্ত্রগুপ্তি ক্ষমতা ও কার্য্য-দক্ষতা চাই। মন্ত্রগুপ্তি সম্বন্ধে এত বলিয়াছি যে এখানে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। কার্য্যদক্ষতার দুইটি অঙ্গ আছে, সেই দুইটি অবলম্বন করিয়াই ক্ষেত্রনীতি ও সমরক্রীয়াকৌশলের সৃষ্টি। কর্ম্মীর মধ্যে কেহ কেহ অতি সুচারুরূপে উপায় উদ্ভাবন ও নির্ব্বাচন করিতে পারে, তাহার বুদ্ধি শিক্ষা অভিজ্ঞতা নীতির পরিপোষক; আবার অপর কোন কর্ম্মী হয়ত সেই উপায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে কার্য্যক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে পারে, তাহার বুদ্ধি শিক্ষা অভিজ্ঞতা ক্রীয়ার বিকাশক। সেনানী-দিগেরও মধ্যে এই প্রকার নীতিজ্ঞান ও ক্রিয়াকুশলতার প্রভেদ আছে; কিন্তু যে সেনাপতিকে অক্ষৌহিনী বা অনীকিনী যুদ্ধে স্বহস্তে চালনা করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে, তাঁহার একাধারে নীতিজ্ঞান ও কার্য কুশলতা দুইই চাই। সেনাপতি তাঁহার কোন কার্য্যই অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থায় রাখিবেন না, সকল বিষয়েই পূর্ণতাকাঙ্খী হইবেন, ভবিষ্যদ্দর্শী পরিণামজ্ঞ সেনাপতির কর্ম্মের গতি অব্যর্থ হইবে—অযথা শক্তিব্যয় ভবিষ্যদ্দর্শীর লক্ষন নহে; পূর্ণতাকাঙ্খা, অব্যর্থ কর্ম্ম ও ভবিষ্যদৃষ্টি এই তিনটি গুণই জার্ম্মান সেনানীগণের সংস্কারগত। (German Soldier's precision, thoroughness and fore-thought) সেনানী কি বিপদে কি সম্পদে রণপটুতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি

হারাইবেন না, জয়লাভে কিরূপে পরাজিত শত্রুকে অধিকতর পীড়িত ও বিক্ষিপ্ত করিতে হয় এবং পরাজয়ে জয়ী শত্রুর সম্মুখে আত্মরক্ষা করিয়া কি প্রকারে প্রায় অক্ষত বল লইয়া পশ্চাদপদ হইতে হয়, এ উভয়েই সেনানী তুল্য অভিজ্ঞ হইবেন। সেনাপতির লভ্য এই সকল গুণের শ্রেষ্ঠগুণ তাঁহার নূতন শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা (adaptability or willingness to learn new lessons). হয়ত বাল্যকাল হইতে বিদ্যালয়ে গুরুমুখে অভিজ্ঞতায় ও রণক্ষেত্রে যে নীতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছি, আজ যুদ্ধের এমন এক অবস্থা আসিল যে তাহার ঠিক বিপরীত নীতিই অবলম্বনীয় হইল; তখন সংস্কার অভ্যাস অন্ধবিশ্বাস ভুলিয়া সরল শিশুর ন্যায় সেই নূতন শিক্ষা শিখিতে হইবে। জার্ম্মানগণ ঘনরেখায় সৈন্য সন্নিবেশের পক্ষপাতী, কিন্তু অনেক সময়ে তরল রেখা না অবলম্বন করিলে শত্রুর শত্রুমুখে সেনাবল উৎসন্ন হইয়া যায়। ইংরাজগণ পদাতিকের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু বুয়ার যুদ্ধে তাঁহাদিগকে অশ্বারূঢ় পদাতিকের আবশ্যক বাধ্য হইয়া শিখিতে হইয়াছে। কেবল এই সকল গুণের উন্মেষ হইলেই সেনানী হওয়া যায় না, সামান্য যোদ্ধার পদ হইতে কার্য্যক্ষেত্রে যে ক্রমে পদোন্নতি লাভ করে, সেই প্রকৃত সেনানী হইতে পারে; কারণ সামান্য সিপাহী হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ সেনানীর কর্ত্তব্য অবধি সকল তত্ত্বেই তাহার অভিজ্ঞতা লাভ ঘটে। কথায় বলে যে আদেশ পালনে দক্ষ নহে সে আদেশ দানেরও অযোগ্য, যে কখনও স্বয়ং নীত চালিত হয় নাই তাহার নেতা হইবার ক্ষমতা জন্মে না। তবে অবশ্য আজন্মবীর নাপলিয়ঁ, মহারাণা প্রতাপের তুল্য ব্যক্তির বিষয়ে এ তত্ত্ব খাটে

না, যাঁহার নেতৃত্ব চরিত্রগত, সংস্কারগত, তাঁহাকে এত কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয় না।

নেতৃত্ব অতি দুরূহ ও দায়িত্বময় কার্য্য; কিন্তু আততায়ী পক্ষের সেনানীর কর্ত্তব্য আরও কঠিনতর। কারণ বর্ত্তমান রণশাস্ত্র প্রমাণিত করিয়াছে যে আত্মরক্ষী পক্ষ (defensive) আততায়ীর অপেক্ষা বহুগুণে অধিক শক্তিশালী। কারণ নবীকৃত ধনুর্ব্বেদে যতপ্রকার সংহারক অস্ত্র আছে আত্মরক্ষী আপন গণ্ডীতে গুপ্ত রহিয়া সে সকলই শত্রু ধ্বংসে নিয়োগ করে, এবং নানা কূটনীতি ও মায়াকৌশলের সৃষ্টি করিয়া তাহার শক্তি সংহরণে প্রবৃত্ত হয়। অপরপক্ষে আততায়ীকে নানা অসুবিধার মধ্যে আত্ম প্রকাশ করিতে হয়, গুপ্ত প্রতিপক্ষের নানা অজ্ঞাত ফাঁদে পড়িতে হয় এবং নানা কৃত্রিম ও অকৃত্রিম বাধা অতিক্রম করিয়া শত্রুরচিত বহু দুরারোহ খাতপরিখাস্তূপবেষ্টন উত্তীর্ণ হইয়া মরিতে মরিতেও যথেষ্ট বল লইয়া ব্যূহকেন্দ্রস্থ শত্রুর উপর প্রহার আরম্ভ করিতে হয়। ব্যূহপ্রচ্ছন্ন ১০০০ আত্মরক্ষীকে আক্রমণ করিতে ৮০০০ আততায়ী সৈন্যের আবশ্যক, আত্মরক্ষী পক্ষে উৎকৃষ্টতর কামান থাকিলে অনেক সময়ে আট হাজারেও কুলায় না। এই জন্য ব্লক সাহেব (Block) তাঁহার Modern Weapons and Modern War নামক পুস্তকে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে আত্মরক্ষী পক্ষ আততায়ী হইতে অন্ততঃ আটগুণ অধিক শক্তিশালী। ৫০ হাজার অর্দ্ধশিক্ষিত কূটযোদ্ধা বুয়ার কৃষক তিন লক্ষ সুশিক্ষিত ইংরাজ সেনাকে পরাস্ত করিয়া এবং প্রায় অর্দ্ধলক্ষ সৈন্য বিনাশ করিয়া সেই মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। প্রচ্ছন্ন শক্তি প্রকাশ্য

শক্তি অপেক্ষা বহুগুণে বীর্য্যশালী, একথা ধ্রুব সত্য। আজ আর শিশোদিয়া, শিখ, মরাঠা বা কায়স্থ রাজের অন্ধ উদ্যম অপ্রতিহত বীরত্বেই কেবল রণলক্ষ্মী কাহারও অঙ্কশায়িনী হ'ন না, সংহারক উৎকৃষ্ট রণাস্ত্র, কূটনীতির আসুরী মায়া ও অপূর্ব্ব মন্ত্রগুপ্তিই বিজয়চণ্ডীর অর্ঘ্য হইতে পারে।

অব্যবস্থিত সমর।

যখন কোন দুর্ব্বল নিরস্ত্র ও বিজেতার অত্যাচারে পীড়িত জাতি দাসত্ব বন্ধন ছেদন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তখন তাহারা সবল বিজেতার সহিত যুদ্ধে এই অব্যবস্থিত যুদ্ধনীতি অবলম্বন করে। ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তন্মধ্যে অমিতশক্তি দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র জাতির অভ্যুত্থানই উল্লেখযোগ্য। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় তাঁহার 'বাজীরাও'এর দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে "মহারাষ্ট্রীয় সমর নীতি" শীর্ষক প্রবন্ধে শিবাজীর যুদ্ধপ্রণালীর আলোচনা করিয়াছেন। রণনীতির পাঠকগণের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ যে, তাঁহারা যেন এই পরিশিষ্ট পরিচ্ছেদটী পাঠ করিয়া দেখেন।

অব্যবস্থিত সমর কি? এই পদ্ধতিতে সম্মুখ যুদ্ধ নাই, সমরনীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ আবশ্যক হয় না, এবং শত্রু দমন করিতে ইহা বিশাল বাহিনী বা বৃহৎ আয়োজনের অপেক্ষা করে না। কোন বিজীত জাতি যখন অত্যাচারী বিজেতার উৎপীড়নে উত্যক্ত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে বিপ্লব আরম্ভ করে, তখন তাহারা এই অব্যবস্থিত নীতি অবলম্বন করে। বিদ্রোহী-

গণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া সমস্ত দেশ জঙ্গলের মত ছাইয়া ফেলে, এবং রসদ বারুদ অস্ত্রাদি লুণ্ঠন করতঃ শত্রু বাহিনীকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে। ইহারা সুবিধা পাইলে শত্রু সৈন্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলকে সহসা আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে এবং সমস্ত দেশময় অশান্তির প্রবর্ত্তনা করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য বন্ধ করতঃ রাজশক্তির অর্থাভাব ঘটায়। ক্ষুদ্র জায়গীরদারপুত্র শিবাজী বন্য মাওলী ও অশিক্ষিত মরাঠা কৃষকদিগকে দলবদ্ধ করিয়া এই অব্যবস্থিত সমর ক্ষেত্রে দীল্লীর বাদশাহকে উত্যক্ত করিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-রাষ্ট্রের আবির্ভাব হইয়াছিল এই সমর পদ্ধতির বলে। সে দিন পঞ্চাশ সহস্র বুয়র কৃষক তিন লক্ষ্য ইংরাজ সেনাকে পদদলিত করিয়াছে, তাহাও এই অব্যবস্থিত নীতির বলে। কিন্তু বুয়ারগণও কেবল অব্যবস্থিত নীতির আশ্রয় লয় নাই, প্রথমে ব্যবস্থিত নীতির প্রয়োগে সম্মুখ যুদ্ধে অনেক শক্তি ক্ষয় করিয়াছিল। ইহা তাহাদিগের পরাজয়ের একটি কারণ। যখন ভুবনবিজয়ী নাপোলিয়েঁর অস্ত্রাঘাতে ইউরোপ শৃঙ্খলিত ও মৃতকল্প, ফ্রান্সের বিপ্লবোদ্ভূত ভীম শক্তি যখন দৈত্যবলে বিশ্ব সংহার করিয়া ফিরিতেছে, তখন স্পেন সেই দেববলী নাপোলিয়েঁর গতিরোধ করিয়াছিল শুধু এই অব্যবস্থিত নীতির প্রয়োগে।

নিরস্ত্র বিজিত জাতি এই সমর পদ্ধতির বলে লক্ষ লক্ষ সুশিক্ষিত সেনা ও অপর্য্যাপ্ত যুদ্ধসম্ভারকে তুচ্ছ করিতে পারে কিরূপে? কি কি কারণে কূট-সমরী খণ্ড খণ্ড দলকে বিশাল চতুরঙ্গিণী বাহিনীও পরাস্ত করিতে পারে না? পাঠক, কারণ-গুলি এক একটি করিয়া বুঝিয়া দেখুন।

(১) প্রথমতঃ, সমস্ত দেশ এক মহা যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। যদি আততায়ী পক্ষ জানিতে পারে যে শত্রু বৃহৎ বাহিনী লইয়া কোন বিশেষ স্থানে ব্যূহ পাতিয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে পরাস্ত করা একটি মাত্র সম্মুখ যুদ্ধের দ্বারা হইতে পারে, এইরূপে যুদ্ধের পর যুদ্ধে বিদ্রোহীদল নষ্ট করিতে করিতে বিদ্রোহ দমন সহজ হইয়া পড়ে; সিপাহী বিদ্রোহে কতকটা এইরূপই হইয়াছিল। কিন্তু যদি সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া এই শত্রু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে অশান্তি উৎপাদন করে, শাসন ও কর আদায় অসম্ভব করিয়া তুলে, সুবিধা পাইলে রসদ বারুদ লুটিয়া লয়, তার রেল পথ ঘাটও পুল নৌকা ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া দেয়, এবং সমস্ত দেশবাসীর সমবেদনা লাভ করিয়া দৈত্যের বলে দেশের আততায়ী নাশ করিয়া ফিরে, তাহা হইলে সে দেশব্যাপী বিদ্রোহীদলকে দমন করা কঠিন হইয়া উঠে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ রুষ বা আমেরিকার মত প্রকাণ্ড মহাদেশ হইলে এই অসংখ্য কূট সমরী দল ভূতের মত পর্ব্বত নদী, বন, উপত্যকা ও বন্ধুর কাশবনে আত্মগোপন করতঃ আততায়ীর সর্ব্বস্ব নাশ করিতে সহজেই সমর্থ হয়; তখন সেই প্রকাণ্ড মহাদেশ কোটী কোটী সুশিক্ষিত, সৈন্যে ছাইয়া না ফেলিলে ইহাদের ধরা যায় না। কিন্তু কোটী দূরের কথা কোন্ রাজ্যের আজ দশ লক্ষ মাত্র সৈন্য আছে? বুয়ার যুদ্ধে ঐ ক্ষুদ্র দেশ ছাইয়া ফেলিতে ইংরাজের তিন লক্ষ সৈন্য আবশ্যক হইয়াছিল। তাহারও সব ইংরাজ নহে, অনেক রেজিমেণ্ট আইরিশ, স্কট, ও নানা ইংরেজাধিকৃত দেশবাসী।

(২) এই কূটসমরী দল, স্বদেশ যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে

চিনে, ইহার পথ ঘাট, বন প্রান্তর, গিরিগুহা, জলা নদী ও গ্রাম নগর ইহাদের নিকট যেমন সুপরিচিত, আততায়ীর নিকট সেরূপ নহে। সুতরাং বিদ্রোহীগণ যত উত্তম যুদ্ধভূমি (base of war) নেপথ্যভূমি (theatre of war) ও সহসা আক্রমনের জন্য গুপ্ত স্থান সুলভ হয় সকলগুলিই অগ্রে বাছিয়া অধিকার করে। আজ সাহাবাদের বিন্ধ্যশ্রেণীকে নেপথ্যভূমি বা রসদের কেন্দ্র করিয়া দক্ষিণে বঙ্গ বেহার ছোট নাগপুর উৎসন্ন করিতেছে, আবার বিশাল আততায়ী বাহিনীর আগমনে কাল আচম্বিতে মহারাষ্ট্রের উত্তরস্থ সাতপুরাকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর কাশ্মির পঞ্জাব নেপাল হইতে বল সংগ্রহ করতঃ সমস্ত মহারাষ্ট্র মধ্য প্রদেশ ও কঙ্কণের গহন গিরিমালায় ছড়াইয়া শত্রুর মৃত্যুচক্র রচিতেছে। (ভারতের দৃষ্টান্ত দিলাম কারণ মানচিত্রজ্ঞ পাঠক তাহা হইলে ব্যাপার সহজে বুঝিতে পারিবেন।) এইরূপে চিরপরিচিত স্বদেশে বিদ্রোহী কূটসমরীগণ সহজেই তাহার অনুকূল স্থানগুলি করায়ত্ত করে; বিদেশ-সমাগত আততায়ী সৈন্য বহু বলের সাহায্য ব্যতীরেকে তাহা পারে না। "absent-minded war" নামক বুয়ার যুদ্ধের সমালোচনা পুস্তকের একস্থানে সমরপ্রবীণ লেখক বলিতেছেন, যে the power of quickly reading a strange country অর্থাৎ কোন অপরিচিত দেশের অনুকূল ভূমিগুলি একবার দৃষ্টিপাতে অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করিয়া ফেলিবার ক্ষমতাই সেনাপতির লক্ষণ।

৬। স্বদেশে থাকিয়া স্বদেশবাসীর সমবেদনা পাইয়া যে অসংখ্য খণ্ড দল কূট-সমরে প্রবৃত্ত হয়, তাহার রসদ ও অস্ত্রাগার,

বহু দক্ষ সেনাপতির দ্বারা পরিচালিত চরপদাতিকঅশ্বারোহী-তোপময় চতুরঙ্গিণী সেনা এবং রেল, টেলিগ্রাম, পথঘাট, তরী সেতু প্রভৃতির বিপুল আয়োজন আবশ্যক করে না। কারণ বিদ্রোহ দেশের কল্যাণ করিবে এই আশায় দেশবাসীই সানন্দ চিত্তে অশেষ অত্যাচার সহ্য করিয়াও তাহাদিগের চরের কার্য্য করে; শত্রুর অবস্থান বা গতি বিধির সংবাদ আনিয়া দেয়, শত্রুর নিকট হইতে বিদ্রোহীদলের সন্ধান গুপ্ত রাখে বা তাহাদিগকে ভুল সংবাদ দিয়া ভুল পথে লইয়া গিয়া গুপ্ত শত্রুর হস্তে তাহাদিগের ধ্বংস সাধন করে। তদুপরি যে গ্রামে যে দল উপস্থিত হয় সেই গ্রামবাসী তাহাদিগের আহার যোগায়; গ্রামবাসীগণ নিতান্ত দরিদ্র হইলে গ্রামের যে কোন ধনী ব্যক্তি সানন্দে নিজ কোষাগার হইতে অর্থ দিয়া যোদ্ধৃদলের রসদের ব্যবস্থা করে। অতএব সংবাদ বহন, সংবাদ সংগ্রহ, পথ প্রদর্শন, রসদ সরবরাহ এবং এমন কি অসি ধরিয়া দলবদ্ধ হইয়া শত্রুকে নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্থ করতঃ যোদ্ধৃদলকে সাহায্য করে। কুটসমরীগণের ধনাগার, শষ্যাগার বা অস্ত্রাগার সকলই অরণ্যে গুপ্ত গুহায় অথবা ভূগর্ভে লুক্কাইত থাকে, সুতরাং তজ্জন্যও তাহাদিগকে কোন বিপুল আয়োজন করিতে হয় না!

৪। অব্যবস্থিত সমর রুষ জাপান যুদ্ধ বা শিখ যুদ্ধের ন্যায় কয়েকটী মাত্র খণ্ড যুদ্ধেই (battles) সমাপ্ত হইতে পারে না। সহসা আত্মপ্রকাশ করিয়া অসহায় অল্প সংখ্যক শত্রুকে উৎসন্ন করা এবং শত্রুর যত আয়োজন ও উপকরণ নষ্ট করিয়া তাহাকে ক্রমে অবসন্ন করাই অব্যবস্থিত যুদ্ধের উদ্দেশ্য। দেশে

এই অরাজক অবস্থা এই অবিশ্রান্ত রক্তপাত ও রক্ষযন্ত্র-নাশ যত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় বিদেশীয় রাজ শক্তি ক্রমশঃ ততই ক্ষতিগ্রস্থ হইতে থাকে। দেশব্যাপী এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের উপদ্রবে রাজকর আদায় হয় না, রাজার ব্যবসায় জনিত লাভ বন্ধ হইয়া যায়, বিজীত দেশ হইতে স্বদেশে শস্য ও নানা খাদ্য সম্ভার এবং তুলা, পাট, তিসি চর্ম্ম ও স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতির আমদানির পথেও কাঁটা পড়ে। এইরূপে বিজীত দেশে বিদ্রোহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ায় রাজার স্বদেশবাসী প্রজা রাজকর হারাইয়া খাদ্যসামগ্রী হারাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য হারাইয়া এবং অসংখ্য অর্থকরী চাকুরী হারাইয়া, আকস্মিক দুর্ভিক্ষ গ্রাসে পতিত হয়, শ্রমজিবীদিগের দুর্গতি (labour crisis) অতি ভয়ানক আকার ধারণ করে; এবং দিন দিন অন্নবস্ত্রহীন বেকার লোকের (unemployed). সংখ্যা বাড়িতে থাকে, এইরূপে বিদেশী রাজশক্তিকে উভয় সঙ্কটে পড়িতে হয়।

৫। যাহারা নিরস্ত্র বিজীত অবস্থা হইতে বিদ্রোহী হইয়া অব্যবস্থিত সমরপদ্ধতি অবলম্বন করে তাহারা রণকৌশলে রাজসৈন্যের সমকক্ষ না হইলেও অনেক বিষয়ে তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। ধনী এবং পররাষ্ট্রাপহারী রাজার বেতন-ভোগী সৈন্য স্বভাবতঃই বিলাসী ও অল্পকষ্টসহিষ্ণু হয়; প্রত্যেক সৈনিককে অস্ত্র শস্ত্র পোষাক পরিচ্ছদ এবং অশ্ব দিয়া যুদ্ধোপযোগী করিতে রাজার বহু অর্থ ব্যয় হয়; তদুপরি তাহাদিগের জন্য মদ্য, মাংস প্রভৃতি সাহায্য এবং টোটাগুলি সরবরাহ করিতেও কম অর্থ ব্যয় হয় না। কিন্তু যাহারা দেশের উদ্ধারের জন্য মৃত্যুপণ করিয়া অব্যবস্থিত পদ্ধতি

অবলম্বন করে, তাহারা স্বভাবতঃই মিতাহারী ও কষ্টসহিষ্ণু হয়, সামান্য কয়েক মুষ্টি শস্যেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া তাহারা কি রৌদ্রে কি পদব্রজে এবং কি সামান্য রজ্জুযোগে শূন্য অশ্বপৃষ্ঠে বহুদূর গমন করিতে পারে; এই ভারতেই যুদ্ধব্যবসায়ী ভারত-বাসীর মিতাহারের বিষয়ে প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে—

কভি ঘৃত ঘনা,

কভিমুষ্টি ভর চানা,

কভি ওভি মানা।

মারোয়ারে অম্বরাধিপের সৈন্যের আহার ছিল "বাজরাকা রোটি আউর মোট রাকা ডাল" শিবাজীর মাওলি সৈন্য শুষ্ক ছোলা চিবাইয়া হিন্দুস্থানের বাদশাহের লক্ষ লক্ষ রণবিশারদ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করিয়া ছিল। বিজীত জাতি দরিদ্র ও উৎপীড়িত বলিয়া চিরকালই স্বভাবতঃ বিলাসপরাঙ্মুখ, মিতাহারী, কষ্টসহিষ্ণু, শ্রমশীল ও মৃত্যুভয়বর্জ্জিত; অধিকন্তু তাহারা দেশানুরাগের উন্মত্ত তান্ত্রিক, তাই মরাঠার "হর হর মহাদেও" এত ভীষণ, তাই খালসা সৈন্যের "ওয়া গুরুজিকী ফতে" ধ্বনি ইংরাজেরও হৃদ-কম্প উপস্থিত করিত, তাই রাজোয়াড়ার রাঠোর শিশোদিয়া ও মারোয়ারী বীরের সুশাণিত খড়্গ প্রতি ভারতাপহারী ম্লেচ্ছ জাতির পৃষ্ঠে অপমানের ক্ষত চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে।

অব্যবস্থিত সমর দীর্ঘকাল চালাইলে ইহা অবস্থাচক্রে ক্রমে ক্রমে কতকটা ব্যবস্থিত সমরে পরিণত হয়, অরাজকতা

এবং রক্তক্ষয় যতই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, ততই মাঝে মাঝে সম্মুখ যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কূট যুদ্ধই শেষে ব্যবস্থিতে পরিণত হয়।

আমরা সমর-নীতি ও অস্ত্রাদি সম্বন্ধে নূতন উদ্ভাবন বিষয়ে আলোচনা করিতেছি বটে, ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য পাঠকগণকে কূট যুদ্ধনীতির অপূর্ব্ব শক্তি বুঝাইয়া দেওয়া। কিন্তু তাহার ফলে যদি কেহ বুঝিয়া থাকেন যে, সবল রণবিশারদ জাতির সহিত দুর্ব্বলের শক্তি পরীক্ষা করিতে হইলে তাহার পক্ষে কেবল কূটনীতিই অবলম্বনীয়, তাহা হইলে তিনি একটু ভ্রমে পতিত হইবেন।

জেতার সহিত বিজিতের বা আততায়ী বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধানভিজ্ঞ দেশবাসীর বাহুবল পরীক্ষা করিতে হইলে দুর্ব্বল পক্ষ অবশ্য কূটনীতি অনুসরণ করিয়া রণবিশারদ বিপুলশক্তি শত্রুকে অবসন্ন করিয়া লইবে; কিন্তু দীর্ঘ যুদ্ধের সকল অবস্থায় এ নীতিতে সুফল ফলে না। কথাটি একটু বিশ্লেষণ করিয়া লইলে সহজে বোধগম্য হইবে।

কূট-নীতি অবলম্বনে শত্রুকে কিরূপে অবসন্ন ও ক্ষীণবল করিতে হয় তাহা এক প্রকার বুঝা গিয়াছে; অল্প কথায় বলিতে গেলে শত্রুর বিরুদ্ধে অগণ্য চরনিয়োগ করিয়া তথ্য সংগ্রহ-করিতে হইবে; শত্রুর অস্ত্রাদি যাহা পথে আসিতেছে, বা

যাহা অল্প সৈন্যের প্রহরায় রক্ষিত আছে, তাহা লুণ্ঠন বা ধ্বংস করিতে হইবে; শত্রুর সঞ্চিত বা প্রেরিত শস্য লুণ্ঠন এবং দেশ হইতে শস্যাদি সংগ্রহ অসম্ভব করিতে হইবে; শত্রুর রচিত পথ, ঘাট, সেতু, নৌকা, তরী, রেল, তার ও টেলিফোন নষ্ট করিতে হইবে; অল্প সংখ্যক সৈন্য বা চরদলকে অসহায় অবস্থায় পাইলে বা এক আধটা দীর্ঘ পর্য্যটনে অনাহারে শ্রান্ত বাহিনীর সন্ধান জানিলে তাহা অচিরে ধ্বংস করিয়া শত্রুর লোকবল হ্রাস করিতে হইবে; এবং গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা বা অব্যর্থ-সন্ধানী সৈন্য সাহায্যে তাহাদিগের সেনানী ও সেনাপতি দিগকে হত্যা করিতে হইবে। ইহাই মুখ্যতঃ কূট-সমরীর কর্ত্তব্য কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যখন কূট-সমরীদল এই সকল উপায় অবলম্বনে শত্রুকে সন্ত্রস্ত ও উৎসন্ন করিতেছে, তখন শত্রুও তাহার অপর্য্যাপ্ত তোপ রাইফেল ও লক্ষ লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবে না, তাহারাও ঐ সকল মারাত্মক কূটনীতির প্রতিকারের চেষ্টা করিবে। এখন আলোচ্য বিষয় এই যে, কূট সমরীকে ধ্বংস করিতে শত্রু কি কি উপায় গ্রহণ করিতে পারে।

১। শত্রু ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া দেশদ্রোহী বা ভীরুস্বভাব সামন্ত রাজগণকে বা নগরবাসীগণকে আশ্রয় ও অর্থের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া সপক্ষে লইবে।

২। যে যে স্থানের অধিবাসীরা বিদ্রোহীদলের সহিত মিলিত হইয়াছে বা সাহায্য করিতেছে বুঝিবে, তথায় বহু সৈন্য চালনা করিয়া ভীষণ লোমহর্ষক অত্যাচারে তাহাদিগের ও দেশবাসীগণের মনে ত্রাস জন্মাইবার চেষ্টা করিবে।

৩। কূট-সমরীগণের সহিত বহু অনিবার্য্য খণ্ডযুদ্ধে যত অধিক সম্ভব সৈন্য নাশ করিবার চেষ্টা পাইবে।

৪। দিকে দিকে চর দ্বারা অন্বেষণ করিয়া কূট-সমরী দলকে বৃথা শক্তিক্ষয়কারী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য করিবে।

৫। কোন এক জেলায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আছে, সন্ধান পাইলে সহসা চতুরতা পূর্ব্বক লক্ষ লক্ষ সৈন্যের বেড়া জালে ধরিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিবে। ইংরাজরাজ বুয়ারযুদ্ধে বহুবার এই চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চেষ্টার ফলে জেনারাল ক্রঞ্জি একাধিকবার ইংরাজ হস্তে অবরুদ্ধ হন।

৬। দেশ লুণ্ঠন, দেশবাসী হত্যা ও নগর গ্রাম অগ্নিসাৎ করিয়া কূট-সমরীগণের ক্ষতি সাধন করিবে।

৭। দেশ ক্ষুদ্র হইলে বহু সৈন্য আনিয়া তাহা ছাউনী ও তোপ বুরুজে ছাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে।

৮। বিদেশে সমুদ্র পথে সংবাদ প্রেরণ রণতরীর দ্বারা বন্ধ করিয়া বিদ্রোহীগণের বিষয়ে অতিরঞ্জিত নিন্দাবাদ প্রচার করতঃ তাহাদিগকে বৈদেশিক সহানুভূতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে; ইহাতে কূট-সমরী দলের পক্ষে উপকরণ সংগ্রহ ও স্বতন্ত্রেচ্ছু বহু স্বেচ্ছাসেবক যোদ্ধা ও গোলন্দাজ এবং খনক ও বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির সহায়তা লাভ কঠিন হইয়া উঠিবে; ইত্যাদি।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শত্রু অনেক উপায়ে কূট সমরীকে ক্ষতিগ্রস্থ করিতে পারে। অবশ্য চতুর সমরনীতিজ্ঞ সেনাপতি ভারত বা রুষিয়ার ন্যায় বিশাল দেশে যুদ্ধভূমি রচনা করিতে পাইলে এবং স্বদেশানুরাগে উন্মত্ত বহু কূট-

যোদ্ধৃদল চালনা করিতে পাইলে শত্রুর এ সকল কৌশলও ব্যর্থ করিতে পারে। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে নানা যুদ্ধ হইতে দৃষ্টান্ত দ্বারা ক্রমে বিষদরূপে বুঝাইবার বাসনা রহিল। আপাততঃ কেবল আলোচনার দ্বারা বুঝান ব্যতিরেকে গত্যন্তর নাই। কূটসমরীদল কি উপায় অনুসরণ করিলে শত্রুকে এই সকল সাঙ্ঘাতিক কৌশল অবলম্বনে বিরত রাখিতে পারে, তাহা চিন্তা করিতে গেলে প্রথমেই মনে হয় যে, কূট সমরীপক্ষের উচিত শত্রুকে মুহুর্মুহু বিষম বিপদে ফেলিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখা। তাই প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি যে, কূট সমরীকেও ব্যবস্থিত পদ্ধতি ক্ষণে ক্ষণে গ্রহণ করিতে হইবে।

১। First blow is half the battle, যে প্রথমে শত্রুপক্ষের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া মর্ম্মান্তিক আঘাত করিতে পারে, জয়শ্রী তাহারই অঙ্কশায়িনী হন। এই নীতিই, কি ব্যবস্থিত কি অব্যবস্থিত সকল যুদ্ধেই প্রকৃষ্ট নীতি। শত্রুকে যদি ভাবিবার বা প্রথম আক্রমণ করিবার অবসর দিলে, তাহা হইলে শত্রু নানা উপায়ে তোমায় দমন করিতে প্রয়াস পাইবে। কূটসমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া যে যুদ্ধ করিব না, তাহা নহে; বরঞ্চ চরমুখে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য লইয়া শত্রুকে মুহুর্মুহু বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে, পশ্চাতে অতর্কিত ভাবে আসিয়া আক্রমণ করিতে হইবে; সে আঘাতের পর আঘাতের যেন বিরাম না ঘটে। আজ প্রাতে এক স্থানে রসদ লুট হইল, কাল বারুদের সাহায্যে পাঁচটি সেতু উড়িয়া গেল, আবার হয়তঃ রাত্রে অতর্কিত আক্রমণে শত্রু পক্ষের কতক সৈন্য ক্ষয় হইল, কতকগুলি কামান ও রাইফেল হস্তচ্যুত হইল, এবং ছাউনী অগ্নিতে ভস্মীভূত

হইয়া গেল। সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া এইরূপ ক্ষণে ক্ষণে আক্রান্ত হইলে শত্রু স্বয়ং আততায়ী হইবার অবসর পাইবে না, আত্ম-রক্ষার্থে ব্যস্ত থাকিবে।

২। মাঝে মাঝে হয়তো চরমুখে সংবাদ পাওয়া যাইবে যে তিন সহস্র শত্রু কোন এক বিশেষ রাত্রে গভীর অরণ্য অতিক্রম করিয়া নদী পার হইবে ; তখন সেই জেলার নানা খণ্ড দলকে একত্রিত করিয়া এই তিন সহস্র সৈন্যকে অতর্কিত আক্রমণে ধ্বংস করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় আক্রমণের সময়ে শত্রু যদি কোন কারণে সতর্ক থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধ অনিবার্য্য। সতর্ক না থাকিলেও রাইফেলধারী শত্রু সৈন্য নিতান্ত বিনা যুদ্ধে প্রাণ দিবে না।

৩। মধ্যে মধ্যে শত্রুর রক্ষিত কোন দেশদ্রোহী সামন্ত রাজার উচ্ছেদের জন্য কয়েকটি দলকে যুদ্ধার্থে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে ; হয়তো তাহাকে না দমন করিতে পারিলে সে জেলা কূট সমরের লীলাভূমি হইতে পারিতেছে না, হয়তো সেই সামন্ত রাজার আশ্রয় পাইয়া শত্রু সেই জেলাকে কেন্দ্র করিবার প্রয়াস করিতেছে ; এরূপ অবস্থায় বিলম্বে ক্ষতির সম্ভাবনা। রসদ বা অস্ত্রাদি কোথায়ও অল্প সৈন্যের প্রহরায় সঞ্চিত আছে জানিলে অল্প বিস্তর যুদ্ধ অনিবার্য্য ; একেবারে অতর্কিত আক্রমণে বিনা রক্তপাতে তাহা হস্তগত করা কঠিন হইতে পারে।

৪। ব্যাঘ্রের পশ্চাতে ফেরুপালের ন্যায় শত্রু বাহিনীর অগ্রে, পশ্চাতে, আশে পাশে থাকিতে থাকিতে কতকগুলি খণ্ড দল শত্রুর কৌশলে বা কোন সপক্ষীয় লোকের বিশ্বাসঘাতকতায়

বেড়া জালে ধরা পড়িতে পারে, তখন তাহাদিগকে সে জাল ছিন্ন করিতে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে হইবে; সুতরাং ব্যবস্থিত সময়ের পদ্ধতি কতক কতক না জানিলে সৈন্য না হউক অন্ততঃ সেনানীগণ আত্মহারা হইয়া পড়িবেন।

৫। যেখানে চরমুখে সংবাদ আসিবে যে কোন এক শত্রু বাহিনী রসদ ও অস্ত্রাভাবে এবং নানা দলের উপর্যুপরি আক্রমণে পরাজিতপ্রায় ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তখন অবিলম্বে ভীম বেগে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ না করিলে নূতন শত্রু দলের সহিত মিলনে তাহারা দুরাক্রম্য হইয়া উঠিতে পারে। এরূপ অবস্থায় সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুকে বাহুবল পরীক্ষায় আহ্বান করা নিতান্ত প্রয়োজন, অতর্কিত আক্রমনের অবসরের জন্য বসিয়া থাকা যুক্তিযুক্ত নহে।

৬। যুদ্ধ যত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে, বিদ্রোহ বা কূটসমর ততই নব নব দলের সহায়তায় রুদ্রতর মূর্ত্তি ধারণ করিবে, ততই ক্ষয়িতবল শত্রুকে উপর্যুপরি আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করা আবশ্যক হইয়া উঠিবে। যতই অধিকতর ধন জন অস্ত্রাদি নষ্ট হইয়া এবং দীর্ঘকাল যুদ্ধহেতু শত্রুপক্ষীয়ের স্বদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়া তাহাকে ক্লান্ত করিয়া ফেলিবে, কূট-সমরী দল ততই বৃহত্তর দলের কখনও বা বাহিনীর সৃষ্টি করিয়া কয়েকটি সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করতঃ পরিশ্রান্ত ক্ষীণবল শত্রুকে মৃতকল্প করিয়া ফেলিবে; নহিলে পরাজিতপ্রায় শত্রুরও পরাজয়ে বিলম্ব ঘটিয়া দেশে অনর্থক কৃষি বাণিজ্যাদির ব্যাঘাত ঘটিবে, হয়তো দীর্ঘকাল কোন প্রকৃষ্ট শাসন যন্ত্রের অভাবে অরাজকতা বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং যুদ্ধ যতই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে, ততই

অব্যবস্থিত সমর ব্যবস্থিতে পরিণত হইবে, নহিলে শত্রুর পরাজয়ের আশু পরিসমাপ্তি হয় না।

অব্যবস্থিত সমরেও ব্যবস্থিত পদ্ধতি মাঝে মাঝে অবলম্বন করিতে হইবে অতএব তর্ক উঠিতে পারে যে, নিরস্ত্র দুর্ব্বল বিজীত জাতি রণনীতিতে একবারে অজ্ঞ ও ভীরুস্বভাব হইয়াও কিরূপে সশস্ত্র শিক্ষিত সৈন্যের সহিত সমরাঙ্গনে দাঁড়াইবে? ইহার উত্তর অতি সহজ। বিজীত জাতির পক্ষেও সমর ক্ষেত্রে জয়শ্রীলাভ করা অসম্ভব নহে; জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত পুনঃ পুনঃ ঘটিয়াছে। বিজীত নিরস্ত্র জাতি হইলেও তাহারা যদি দেবভোগ্য স্বাধীনতা সুধা পানে অমর হইতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হয়, যদি মার ভবিষ্যৎ গৌরব স্মরণ করিয়া মরণকে কাম্য বলিয়া গ্রহণ করে, তাহা হইলে স্বয়ং দেবাদিদেব তাহাদিগের ভালে বীরত্বের টীকা অঙ্কিত করিয়া দেন। তখন তাহাদিগের দ্বারাই ব্যবস্থিত সমরও সম্ভব হয়; কারণ

(১) দেশানুরাগে মত্ত হইয়া দেশী শিক্ষিত সৈন্য বিদেশী রাজার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধমান বীর দলের সহায় হয়।

(২) যত দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য ও যুদ্ধব্যবসায়ী জাতি বিপ্লবের লোল অগ্নিজিহ্বা দর্শনে উত্তেজিত হইয়া রণক্রীড়ায় যোগ দেয়।

(৩ অব্যবস্থিত যুদ্ধে দেশের যুবকশক্তি নিয়োজিত হইয়া ক্রমে অস্ত্র বিশারদ ও নির্ভীক হইয়া উঠে, অব্যবস্থিত সমরই তাহাদিগের এক অপূর্ব্ব শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিণত হয়। প্রতিনিয়ত দেশের কল্যাণে জীবন বিপদাপন্ন করিতে করিতে সাহস শ্রমশীলতা, বীর্য্য, অস্ত্রজ্ঞান, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি বীরোচিত গুণের স্ফূর্ত্তি ঘটে।

(৪) দেশের দীর্ঘ অরাজকতা ও সঙ্ঘর্ষের অবসরে লোক-বল বৃদ্ধি ও অর্থ এবং অস্ত্র সঞ্চয়ে সাহস আসে, তখন আর সম্মুখ যুদ্ধে দাঁড়াইতে দ্বিধাবোধ হয় না।

(৫) দীর্ঘ যুদ্ধে শত্রুরও অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে; বহু সৈন্য হতাহত হওয়ায় তাহাদিগের লোকাভাব ঘটে, বহির্বাণিজ্য রাজকর ও অন্য নানা অর্থোপায়ের মূল বন্ধ হইয়া যাওয়ায় নিজ দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, এবং সুবিধা পাইয়া অপর ঈর্ষাপরায়ণ রাজশক্তিও নানা ছলে তাহাদিগকে বিড়ম্বিত করিতে থাকে। এরূপ অবস্থায় সে ক্লান্ত উৎসন্নপ্রায় শত্রুর পরাজয় সাধনার্থে কে না সাহস সঞ্চয় করিতে পারে? তখন কয়েকটি বিষম পরাজয়েই এই অত্যাচারী শক্তির পর্য্যবসান বুঝিয়া দেশবাসী দলে দলে আসিয়া বীরদলের বৈপ্লবিক পতাকাতলে দণ্ডায়মান হয়, বহু রুদ্ধ অর্থাগার সকল দেশযজ্ঞের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে স্বতঃই উন্মুক্ত হয়; দেশে নবোত্থিত স্বদেশী শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় কৃষি বাণিজ্যের পুনরারম্ভ হয়। সুতরাং শত্রু আর ব্যবস্থিত যুদ্ধেও জয়লাভ করিতে পারে না, সামান্য বিদ্রোহীদল সমস্ত দেশকে বীরজাতি হইতে শিখাইয়াছে দেখিয়া তাহারা প্রাণ লইয়া পলায়ন করে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অব্যবস্থিত না ব্যবস্থিত।

গত সাত বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ নূতন রণনীতির অবলম্বনে এবং নবাবিষ্কৃত অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ ঘটিয়াছে, প্রথমতঃ পঞ্চাশ হাজার বুয়ার কৃষকের সহিত মহা-পরাক্রান্ত বৃটিশ রাজের তিন লক্ষ সৈন্যের সংঘর্ষ এবং দ্বিতী-য়তঃ রুষরাজ ও সে দিনকার অসভ্য জাপানের শক্তি পরীক্ষা। তন্মধ্যে রুষ-জাপান যুদ্ধ যে সর্ব্বাংশেই এক বিরাট ব্যবস্থিত সমর তদ্বিষয়ে কাহারও মতবিরোধ নাই। কিন্তু ভারতের বহু সাহিত্যসেবী ও চিন্তাশীল ব্যক্তির ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে বুয়ার যুদ্ধ সর্ব্ববিষয়েই কূটনীতির পরিচায়ক, ইহা অব্যবস্থিত সমর বৈ আর কিছুই নহে।

কিন্তু বুয়ার রণনীতি অভিনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে দেখা যায় যে, এ বিশ্বাস আংশিক সত্য হইলেও সর্ব্বাংশে নহে। সমস্ত বুয়ার যুদ্ধ পাঠ করিয়া রণনীতির পাঠককে এ কথা বুঝাইতে হইলে তাহা এত বৃহৎ হইয়া পড়ে যে কয়েকটী মাত্র প্রবন্ধের গণ্ডীতে তাহাকে আবদ্ধ করা যাইতে পারে না। এই জন্য আমরা কেবল মাত্র এক জন মাত্র সেনাপতির অভিনীত যুদ্ধগুলি হইতেই বুয়ার রণনীতি বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব।

বুয়ার যুদ্ধ ব্যবস্থিত না অব্যবস্থিত? ইহা কেবল মাত্র কতকগুলি সম্মুখ যুদ্ধ পরম্পরায় স্মৃষ্ট এক মহাসমর, না নববুগে নব মাওলী সেনার দক্ষযজ্ঞের পুণরাভিনয় মাত্র? প্রকৃত কথা বলিতে গেলে ইহা উভয়ই; ইহা অবস্থা চক্রের সমবায়ে ব্যবস্থিত ও অব্যবস্থিতের এক অভিনব সংমিশ্রণ। বুয়ার কৃষককে কখন দেখি সামান্য পঞ্চ সহস্র সৈন্য লইয়া ইংরাজকে আক্রমণ করিয়া বিপর্য্যস্ত করিতেছে, আবার কখন দেখি সেই সেনাপতি ডি ওয়েটই (De Wet) পঞ্চাশ জন মাত্র অনুচর লইয়া ইংরাজ সেনাপতি লর্ড রবার্টসের রসদ লুণ্ঠনে ব্যস্ত। বুয়ার বাহিনী কখন সহস্রে সহস্রে জুটিয়া খনিত ব্যূহে দণ্ডায়মান হইয়া সম্মুখযুদ্ধপ্রয়াসী, আবার কখন বা সেই বাহিনীই শত শত খণ্ড দলে বিভক্ত হইয়া মাওলীর লীলা দেখাইতেছে। ইহার হেতু কি? বুয়ার যুদ্ধ ব্যবস্থিত হইয়াও ক্ষণে ক্ষণে অব্যবস্থিতে পরিণত হইতেছিল কেন? ইহার প্রধানতঃ চারিটী কারণ উল্লেখযোগ্য।

প্রথমতঃ বুয়ারগণ আততায়ী ইংরাজ সেনার অপেক্ষা সংখ্যায় কম ছিল। যেখানে বুয়ার আড্ডার (Laager) সংবাদ পাইয়া তাহাদের বিনাশার্থে দুই হাজার ইংরাজ জড় হইতেছে, সেখানে তাহাদিগের বিপক্ষতাচরণ করিবার জন্য হয়তো দুই শত বা তিন শতের অধিক রাইফেলধারী বুয়ার নাই; সুতরাং অবস্থা চক্রে বাধ্য হইয়া বুয়ারদিগের আক্রমণ বা যুদ্ধদানপদ্ধতি কতকটা কুটনীতির অনুযায়ী হইয়াছিল।

নিজ দেশ শত্রুর দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ায় কৃষি ও গো মেষাদির অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাই বুয়ার ইংরাজের রসদ পাইলে তাহা লুটিতে ছাড়িত না; এবং তাহারা সংখ্যায় আততায়ীর অপেক্ষা নিতান্ত অল্প, তাই ইংরাজের অল্পসংখ্যক অসহায় সৈন্যদলের সংবাদ পাইলে তাহা তাহারা ব্যাঘ্রবিক্রমে আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করিত।

দ্বিতীয়তঃ বুয়ারদিগের অতি অল্পসংখ্যকই কামান ছিল, সুতরাং যখনই প্রবল বিপুল ইংরাজ বাহিনী বহু কামান বহর লইয়া বুয়ারের সম্মুখীন হইত, তখনই বুয়ারকে আত্মরক্ষার জন্য কামানের গোলাগতির বাহিরে যাইয়া অবসরের অপেক্ষা করিতে হইত, আত্মরক্ষার্থে রাইফেলসম্বল বুয়ারকে তখনই নানা কৌশল ও যোদ্ধৃ সুলভ ছলনার আশ্রয় লইতে হইত। এই উভয় কারণে বুয়ার সেনাপতিগণ সম্মুখ যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা ইংরাজ সৈন্য ধ্বংস করিতেন। কেবল যে কামানই আবশ্যক মত ছিল না তাহা নহে, যুদ্ধের প্রারম্ভে উত্তম রাইফেলেরও যথেষ্ট অভাব ছিল। বুয়ার দেশের Commondo Law নামক বিধির অর্থ এই যে, প্রত্যেক বুয়ার Burgher নিজ অশ্ব, রাইফেল ও আট দিবসের আহার্য্য লইয়া আবশ্যক হইলেই যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইবে। ষোল বৎসরের বালক হইতে ৬০ বৎসরের বৃদ্ধের বিষয়েও এই আইন প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু বন্দুকের অসদ্ভা হেতু এই বিধি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া এইরূপ করা হইয়াছিল যে, কোন বুয়ার Burgher বন্দুক না আনিতে পারিলে

তৎপরিবর্ত্তে ৩০টি গুলি, ৩০টি ক্যাপ ও এক পোয়া বারুদ লইয়া আসিবে।

তৃতীয়তঃ বুয়ারভূমি ভারতবর্ষ বা রুষিয়ার ন্যায় মহাদেশ নহে, বন্ধুর পর্ব্বতসঙ্কুল বন্যভূমি হইলেও ক্ষুদ্র দেশ মাত্র। সুতরাং তিন লক্ষ সৈন্য ক্রমে ক্রমে শিখরে, স্তূপে, উপত্যকায় সন্নিবেশিত করিয়া চারি শত কামানের সাহায্যে ইংরাজ সহজেই সমস্ত বুয়ার ভূমি ছাইয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছিল। যখন প্রায় সকল দুর্গম অনুকূল স্থানে সৈন্য সমাবেশ করতঃ ইংরাজ পদে পদে বুয়ার দলকে আক্রমণ করিতে লাগিল, তখন ইংরাজের সেই বিক্ষিপ্ত সৈন্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংলগ্ন দলকে আক্রমণ করাই বুয়ারের লক্ষ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু ক্রমে তাহাও অসম্ভব হইয়া পড়িল; কারণ দেশ শৈলময় ও বিশাল না হইলে কূট-যুদ্ধ সম্ভব হয় না; কূটসমরীগণ যদি আত্মগোপন বা সৈন্য সুঙ্ঘটনের জন্য যথেষ্ট স্থান না পায়, তাহা হইলে অতর্কিত আক্রমণ এবং শত্রুর ভ্রম বা দুর্ব্বলতা বুঝিয়া সহসা মর্ম্মান্তিক আঘাত করা কঠিন হইয়া পড়ে।

বুয়ার যুদ্ধের পরিণামে কতকটা অব্যবস্থিত আকার ধারণ করিবার শেষ কারণ বুয়ারগণের সামরিক শিক্ষার অভাব। ১৮৯৯ সালের মহা আহবে বৃটিশ সিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিবার পূর্ব্বে বুয়ার কৃষক কখন কখন বাসুটো, নিগ্রো প্রভৃতি কাফ্রিজাতির সহিতই যুদ্ধ করিয়াছিল, কোন নবরণবিদ্যাবিশারদ জাতির সহিত শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে তাহারা আর একবার ইংরাজ শক্তিকে মাজুবা পর্ব্বতের ঘোরতর যুদ্ধে পরাভূত করিয়া মন্ত্রী মহামতি

গ্ল্যাডষ্টোনের দ্বারা বুয়ার প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করাইয়া লইয়াছিল বটে, কিন্তু সে যুদ্ধ এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, যাহাতে সমস্ত বুয়ার জাতি রণক্ষেত্রে সামরিক শিক্ষা (discipline) লাভ করিতে পারে। বুয়ার কৃষক রাইফেল চালনায় অব্যর্থহস্ত, কষ্টসহনে স্বভাবতঃ অভ্যস্ত এবং অশ্বারোহণে অতি ক্ষিপ্রগামী ছিল; তাই সামরিক শিক্ষার অভাবেও মহাবলী ইংরাজ সেনাকে পরাভূত করিতে পারিয়াছিল। আজকাল সভ্য জগতের শক্তি সমূহের সেনা বিভাগে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার ফলে সৈন্যগণ কলের পুতুলের ন্যায় সেনাপতির আজ্ঞায় কার্য্য করে; রুষ জাপান যুদ্ধে আমরা দেখিয়াছি, যুদ্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রুষ-সেনা পদে পদে হারিতেছে, জাপানীর কামান ও রাইফেলের মুখে অগণ্য অসংখ্য সৈন্য নিত্য প্রাণ দিতেছে; কিন্তু এমনি শিক্ষার গুণ যে তথাপি যুদ্ধের পর যুদ্ধে সেনানীর আজ্ঞায় কাতারে কাতারে সেই দুর্জ্জয় জাপানীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে, যেন তাহারা যন্ত্রপুত্তলি, সেনানী কল টিপিলেই যেন তাহাদের অগ্রসর হইতেই হইবে। কিন্তু বুয়ার সৈন্য এ শিক্ষা পায় নাই, তাহারা স্বদেশানুরাগ ও দুর্জ্জয় আশায় বুক বাঁধিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু যখন সেনাপতি ক্রঞ্জির আত্মসমর্পণে সে আশা নিষ্প্রভ হইয়া আসিল, প্রাণে ইংরাজ-ভূতের ভয় প্রবেশ করিল, তখন আর তাহাদের সোজা করে কে? যে বুয়ার অমিত বিক্রমে অজেয় সাহসে লেডিস্মিথ অবরোধ করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছিল, যে বুয়ার রেডভার্স বুলারকে মুহুর্মুহু যেন পদাঘাতে পশ্চাদ্পদ করিতেছিল, যাহারা মাজুবা,

লেডিস্মিথ, কলেন্‌জো, মাগস্‌ফন্টেন, ষ্টর্ম্‌বার্গ ও পার্ডবার্গের বিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ বীর, তাহারা ক্রঞ্জির আত্মসমর্পণের পর পপ্লার গ্রোভ হইতে ভীত মেষপালের ন্যায় পলায়ন করিল; তাহারা সেনানী সেনাপতির কথা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যে যাহার অস্ত্র ফেলিয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল; ইংরাজ বা জার্ম্মাণীর কোন রেজিমেণ্ট ইহার শতাংশের একাংশ অবাধ্যতা দেখাইলে বিচারে গুলির মুখে প্রাণ হারাইত। এই শিক্ষার অভাবে বুয়ার সৈন্যের যুদ্ধপদ্ধতি ইংরাজ পদ্ধতির অপেক্ষা কিছু বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধকালে প্রত্যেক বুয়ার সৈন্যের যে স্বাধীনতা ছিল তাহা যন্ত্রবৎ চালিত ইংরাজ সৈন্যের নাই। এই স্বাধীনতা ছিল বলিয়াই বুয়ার সৈন্যের অব্যর্থ লক্ষ্য এত কার্য্যকরী হইয়াছিল। বুয়ার সৈন্য স্থান কাল ভেদে অবস্থা বুঝিয়া ঘুরিত ফিরিত। পর্ব্বতান্তরালে বা বৃক্ষতলে আশ্রয় লইত, আবার সেনাপতির আদেশ পাইলে কূট সমরীর ন্যায় স্বাধীন ভাবে রাইফেল চালনা বা আত্মগোপন ও আত্মপ্রকাশ করতঃ শত্রুধ্বংস করিত। অনেক সময়ে সেনানীগণ নিজ কর্ত্তব্য বুঝিয়া লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল চালনা করতঃ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজ বুদ্ধির প্রয়োগে শত্রু সংহার করিয়া ফিরিত। এই জন্য বুয়ার যুদ্ধে কূট সমরনীতির অনুসরণ এত আবশ্যক হইয়াছিল।

কিন্তু সৈন্যের অল্পতা, যথেষ্ট কামানের অভাব, দেশের ক্ষুদ্রায়তন ও শিক্ষার অভাব হেতু বুয়ার যুদ্ধ কতকটা অব্যবস্থিত সমরের প্রকৃতি অবলম্বন করিলেও ইহা সর্ব্বাংশেই ব্যবস্থিত সমর। বুয়ার যুদ্ধের পাঠক অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে

দেখিতে পাইবেন, বুয়ার প্রথম হইতেই ইংরাজকে পদে পদে সম্মুখ যুদ্ধে আক্রমণ করিতেছে, তাহাদের আত্মগোপনের চেষ্টা নাই, বিশাল শত্রু বাহিনীকে দূর হইতে পরিহার করিবার প্রয়াস নাই, শত্রুকে অলক্ষে অসতর্ক পাইয়া উত্যক্ত ও সম্বলহীন করার অপেক্ষা যুদ্ধের পর যুদ্ধে শীঘ্র পরাজিত করিবার বাসনাই বুয়ারহৃদয়ে প্রবল। তাহারা কেবল মাত্র প্রকাশ্য যুদ্ধ দানেই ক্ষান্ত নহে, অবসর পাইলে সহস্র সহস্র ব্যূহবদ্ধ শত্রুকে অবরোধ করিয়া রাখিতেছে, শস্ত্র প্রহারে রেডভার্স বুলারের মহতী চমূকে নেটালের নদী পার হইতে দিতেছে না। কূটসমরী এভাবে শক্তি ক্ষয় করে না, নিতান্ত সুবিধা না দেখিলে, বা বাধ্য না হইলে উপযাচক হইয়া সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না, শত্রু আক্রমণে আসিতেছে শুনিয়া ব্যূহ খনন করিয়া অপেক্ষা করে না, বা বিশাল বাহিনীর সম্মুখীন হইয়া তাহার গতিরোধ বা শত্রুপুরী অবরোধ করে না। পূর্ব্ব এক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে কূট যুদ্ধ ক্রমে ব্যবস্থিত সমরে পরিণত হয়; কিন্তু বুয়ার যুদ্ধ ঠিক তাহার বিপরীত—ইহা ব্যবস্থিত যুদ্ধ হইতে ক্রমে কূট যুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল। কারণ বুয়ার কূট-যুদ্ধ করিতে চাহে নাই, সম্মুখ যুদ্ধার্থেই রণাঙ্গনে নামিয়াছিল, শেষে বাধ্য হইয়া কূটনীতির আশ্রয় লয়। যখন De Wet তাঁহার বাহিনীকে ছয়টি বিভাগ করতঃ বিশটি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিলেন, তখন কলেনজো, মাগার্সফন্টেন্, মডারস্পই, পর্ডেবার্গ প্রভৃতির যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেনাপতি ক্রঞ্জি ও প্রিন্সলু আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তখন আর বৃহৎ সম্মুখ যুদ্ধে শক্তিক্ষয় করিবার সামর্থ্য বুয়ারের

নাই। De Wet নিজমুখে এই অসামর্থ্য স্বীকার করিয়া বলিতেছেন, "We were of the opinion that we should be able to do better work if we divided the Commandos up into small parties. We could not risk any great battles, and if we divided our forces, the English would have to divide their forces too"

বুয়ারকে অব্যবস্থিত নীতি অবলম্বন করিতে দেখিয়া ইংরাজগণ তাহাদিগকে কূটসমরী বলিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিল। নিন্দাবাদের অসমর্থতা প্রমাণ করিতে যাইয়া De Wet বলিতেছেন, "আমরা কি কূটসমরী? কখন নহে। কারণ যে জাতি সম্পূর্ণভাবে বিজিত হইয়া দেশ হারাইয়া তাহার পর বিজেতার বিরুদ্ধে সমরে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই কূট সমরী হইতে পারে। আমরা যতদিন যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলাম, ততদিন আমাদের রীতিমত শাসন বিভাগ রাজ্য ছিল। ইংরাজের রাজধানী আজ শত্রুহস্তগত হইলেও যদি তাহাদের গভর্মেণ্ট বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ইংরাজ জাতিকি "গরিলা" নামে অভিহিত হইতে পারে? কখনই নহে।"

এই বালকোচিত তর্ক শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়। De Wet যোদ্ধা ও কৌশলী সেনাপতি ছিলেন, সাহিত্যিক বা যুদ্ধ নীতির তর্কে অনধিকার চর্চ্চা করা তাঁহার উচিত হয় নাই; এই অনধিকার চর্চ্চা করিয়া তিনি হাস্যাস্পদ হইয়াছেন মাত্র। কূটনীতি যে অবলম্বন করিবে, স্বাধীন হউক বা সুসভ্য প্রবল গভর্ণমেণ্ট হউক, তাহাকেই কূট সমরী বলা যায়। আজ লক্ষ লক্ষ সৈন্য ও অক্ষয় অস্ত্রাগারের অধিকারী

হইয়াও ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যদি কোন শক্তির সহিত সংগ্রামে সম্মুখযুদ্ধ ছাড়িয়া, কূট-সমরে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সহজ বুদ্ধিতে তাহাকে কূট-সমরী ছাড়া কি বলিতে হয় পাঠক বিচার করুন। কূট-সমর যুদ্ধনীতির কথা ইহার যুধ্যমান জাতির শক্তির বা শাসন বিভাগের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। বিশেষতঃ বুয়ারের ন্যায় ক্ষুদ্র দেশের মুষ্টিমেয় জাতির পক্ষে, "গরিলা" অর্থাৎ "কূট-সমরী" একথা গালি নহে; স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে যে কোন যুদ্ধ নীতি বা রাজনীতিক ছলনাই ক্ষমার্হ, বরং গৌরবজনক। ইংরাজ কূট-সমরী বুয়ারকে "Sniping bands" বা "brigands" বলিয়া গালি দিয়াছিল বটে কিন্তু "guerillas" বলিয়া তাহাদিগকে যথার্থনামেই অভিহিত করিয়াছিল।